কাকাবাবু সমগ্র

ভয়ংকর সুন্দর

(কাকাবাবু)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

লীদার নদীর তীরে 2
সোনার খোঁজে, না গন্ধকের খোঁজে? 8
আকাশ পুরনো হয় না 20
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাস্তায় 31
দু চোখে আগুন, এক অশ্বারোহী 42
মূর্তি রহস্য 59
বিপদের পর বিপদ 71
ডাকাতের বউ আর ছেলেমেয়ে 82
তোমাকে আমি ছাড়বো না 100
হোক ভয়ংকর, তবু সুন্দর 117

লীদার নদীর তীরে

আর সবাই পাহাড়ে গিয়ে কত আনন্দ করে, আমাকে সারাদিন বসে থাকতে হয় গজ ফিতে নিয়ে। পাথর মাপতে হয়। ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন কাকাবাবু, আর একটা দিক ধরে টানতে টানতে আমি নিয়ে যাই, যতক্ষণ না ফুরোয়।

আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই। ঝকঝকি করছে আকাশ। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ, রোদ্দুর লেগে চোখ ঝলসে যায়। ঠিক মনে হয় যেন সোনার মুকুট পরে আছে। যখন রোদ্দুর থাকে না, তখন মনে হয়, পাহাড় চুড়ায় কত কত আইসক্রিম, যত ইচ্ছে খাও, কোনওদিন ফুরোবে না।

আমার ডাক নাম সন্তু। ভাল নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমি বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনসটিটিউশানে ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার একটা কুকুর আছে, তার ডাক নাম রকু। ওর ভাল নামও অবশ্য আছে একটা। ওর ভাল নাম রকুকু। আমার ছোটমাসীর বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল আছে। আমি সেটার নাম রেখেছি। লড়াবি। আমি ওকে তেমন ভালবাসি না, তাই ওর ডাক নাম নেই। আমার কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়। আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছি, কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম। কাকাবাবু এই জন্য আমাকে খুব ভালবাসেন।

আজ চমৎকার বেড়াবার দিন। কিন্তু আজও সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, চলো সন্তু, আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক। ব্যাগ দুটোতে সব জিনিসপত্তর ভরে নাও!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাকাবাবু, সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম। আবার ওখানেই যাব?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, ঐ জায়গাটাই বেশি ভাল। ঐখানেই কাজ করতে হবে।

আমি একটু মন খারাপ করে বললাম, কাকাবাবু, আমরা শ্রীনগর যাব না?

কাকারাবু চশমা মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন, না, না, শ্রীনগরে গিয়ে কী হবে? বাজে জায়গা। খালি জল আর জল! লোকজনের ভিড়!

আজ চোদ্দ দিন হল আমরা কাশ্মীরে এসেছি। কিন্তু এখনও শ্রীনগর দেখিনি। একথা কেউ বিশ্বাস করবে? আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় দীপঙ্কর ওর বাড়ির সবার সঙ্গে গত বছর বেড়াতে এসেছিল কাশ্মীরে। দীপঙ্করের বাবা বলে রেখেছেন, ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে, ওকে প্রত্যেকবার ভাল ভাল জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সেইজন্যই তো দু নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়েও আমার দুঃখ হয়নি। কাশ্মীর থেকে ফিরে গিয়ে দীপঙ্কর কত গল্প বলেছিল। ডাল হ্রদের ওপর কতরকমের সুন্দরভাবে সাজানো বড় বড় নৌকো থাকে। ওখানে সেই নৌকোগুলোর নাম হাউস বোট। সেই হাউস বোটে থাকতে কী আরাম! রাত্তিরবেলা যখন সব হাউস বোটে আলো জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় জলের ওপর মায়াপুরী বসেছে। শিকারা নামে ছোট ছোট নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, তাইতে চড়ে যাওয়া যায় যেখানে ইচ্ছে সেখানে। মোগল গার্ডেনস, চশমাসাহী, নেহরু পার্ক-এইসব জায়গায় কী ভাল ভাল সব বাগান।

দীপঙ্করের কাছে গল্প শুনে আমি ভেবেছিলাম যে শ্রীনগরই বুঝি কাশ্মীর। এবার কাকাবাবু যখন কাশ্মীরে আসবার কথা বললেন, তখন কী আনন্দই যে হয়েছিল আমার! কিন্তু এখনও আমার কাশ্মীরের কিছুই প্রায় দেখা হল না। চোদ্দ দিন কেটে গেল। কাকাবাবুর কাছে শ্রীনগরের নাম বললেই উনি বলেন, ওখানে গিয়ে কী হবে? বাজে জায়গা! শুধু জল! জলের ওপর তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। তাই বোধ হয়। কাকাবাবুর পছন্দ নয়। সত্যি কথা বলতে কী, কেন যে কাকাবাবু ফিতে দিয়ে পাহাড় মাপছেন তা আমি বুঝতে পারি না।

অবশ্য এই পহলগ্রাম জায়গাটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু যে-জায়গাটা এখনও দেখিনি, সেই জায়গাটাই কল্পনায় বেশি সুন্দর লাগে। পহলগ্রামে বরফ মাখা পাহাড়গুলো এত কাছে

যে মনে হয় এক দৌড়ে চলে যাই। একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে পহলগ্রাম দিয়ে। ছোট হলেও নদীটার দারুণ স্রোত, আর জল কী ঠাণ্ডা!

পহলগ্রামে অনেক দোকানপাট, অনেক হোটেল আছে। এখান থেকেই তো তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের দিকে যায়। অনেক সাহেব মেমেরও ভিড়। যারা আগে শ্রীনগর ঘুরে পহেলগ্রামে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকে বলে যে শ্রীনগরের থেকে পহলগ্রাম জায়গাটা নাকি বেশি সুন্দর। কিন্তু আমি তো শ্রীনগর দেখিনি, তাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। শ্রীনগরের মতন। এখানে তো হাউস বোট নেই। আমরা কিন্তু এখানেও হোটেলে থাকি না। আমরা থাকি নদীর এপারে, তাঁবুতে! এই তাঁবুতে থাকার ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ। দীপঙ্কররা শ্রীনগরে জলের ওপর হাউস বোটে ছিল, কিন্তু ওরা তো তাঁবুতে থাকেনি! দমদমের ভি-আই-পি রোড দিয়ে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি, মাঠের মধ্যে সৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে আছে। আমারও খুব শখ হত তাঁবুতে থাকার। f

আমাদের তাঁবুটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। পাশাপাশি দুটো খাট, কাকাবাবুর আর আমার। রাত্তিরবেলা দু পাশের পদ ফেলে দিলে ঠিক ঘরের মতন হয়ে যায়। আর একটা ছোট ঘরের মতন আছে এক পাশে, সেটা জামাকাপড় ছাড়ার জন্য। অনেকে তাঁবুতে রান্না করেও খায়, আমাদের খাবার আসে হোটেল থেকে। তাঁবুতে শুলেও খুব বেশি শীত করে না। আমাদের, তিনখানা করে কম্বল গায়ে দিই তো! ঘুমোবার সময়েও পায়ে গরম মোজা পরা থাকে। কোনও কোনও দিন খুব শীত পড়লে আমরা কয়েকটা হট ওয়াটার ব্যাগ বিছানায় নিয়ে রাখি। কত রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পাই। আর কী একটা রাত-জাগা পাখি ডাকে চি-আও! চি- আও!

মাঝে মাঝে অনেক রাত্তির তাঁবুর মধ্যে মানুষজনের কথাবাত শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আমার বালিশের পাশেই টর্চ থাকে। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দেখি। কাশ্মীরে চোর-ডাকাতের ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। টর্চের আলোয় দেখতে পাই, তাঁবুর মধ্যে আর কেউ নেই। কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন। কাকাবাবুর এটা অনেক দিনের স্বভাব। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে যেন তর্ক করেন। তাই ওঁর দু-

রকম গলা হয়ে যায়। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আমার এই সময় একটু ভয় ভয় করে। তখন উঠে গিয়ে কাকাবাবুর গায়ে একটু ঠেলা মারলেই উনি চুপ করে যান।

আমার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে। পরীক্ষার আগে আমি অনেক রাত জেগে পড়তে পারি, কিন্তু ভোরে উঠতে খুব কষ্ট হয়। আর এখানে এই শীতের মধ্যে তো বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছাই করে না। কাকাবাবু খুব ভোরে উঠতে পারেন। আমি জেগে উঠেই দেখি, কাকাবাবুর ততক্ষণে দাড়ি কামানো, স্নান করা সব শেষ। বিছানা থেকে নেমেই আমি তাঁবুর মধ্যে লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি শুরু করি। তাতে খানিকটা শীত কাটে। আজ সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তাঁবুতে থাকার একটা সুবিধে এই দরজায় তালা লাগানো হয় না। তাঁবুতে তো দরজাই থাকে না। দরজার বদলে শক্ত পর্দা, সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয়। আমাদের কোনও জিনিসপত্তর কোনওদিন চুরি হয়নি, কাশ্মীরে নাকি চোর নেই। অবশ্য ডাকাত আছে। সেটা আমরা পরে টের পেয়েছিলুম।

ছোট্ট ব্রিজটা পেরিয়ে চলে এলুম নদীর এদিকে। এই সকালেই রাস্তায় কত মানুষজনের ভিড়, কত রকম রং-বেরঙের পোশাক। যে-দেশে খুব বরফ থাকে, সে দেশের মানুষ খুব রঙিন জামা পরতে ভালবাসে। ঝাঁক ঝাঁক সাহেব মেম এসেছে আজ। ঘোড়াওয়ালা ছেলেরা ঘোড়া ভাড়া দেবার জন্য সবাই এক সঙ্গে চিল্লিমিল্লি করছে। আমরা কিন্তু এখন ঘোড়া ভাড়া নেব না। আমরা বাসে শুরু যাৰ সোনমার্গ। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ভাড়া নিয়ে পাহাড়ে কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয়। তাই আমরা ঘোড়ায় বেশি চড়ি না। প্রথম কদিন আমাদের একটা জিপ গাড়ি ছিল। এখানকার গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছিল। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন। কিন্তু আমার কাকাবাবু ভারী অদ্ভুত। তিনি কোনও লোকের সাহায্য নিতে চান না। দু তিন দিন বাদেই তিনি জিপ গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে তখন বলেছিলেন, সব জায়গায় তো গাড়ি যায় না। যে-সব জায়গায় গাড়ি যাবার রাস্তা নেই-সেখানেই আমাদের বেশি কাজ। খোঁড়া

পা নিয়েই তিনি কষ্ট করে চড়বেন ঘোড়ায়। এই যাঃ, বলে ফেললাম! আমার কাকাবাবুকে কিন্তু অন্য কেউ খোঁড়া বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি তো শুধু একবার মনে মনে বললাম। কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন। মাত্র দু বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওঁর গাড়ি উল্টে যায়। তখনই একটা পা একেবারে চিপসে ভেঙে গিয়েছিল।

কাকাবাবুকে এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। এখন আর একলা একলা নিজে সব কাজ করতে পারেন না বলে কোথাও গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমারও বেশ মজা, কত জায়গায় বেড়াই। গত বছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম মথুরা, সেখান থেকে কালিকট। হ্যাঁ, সেই কালিকট বন্দর, যেখানে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম এসেছিলেন। ইতিহাসে-ভূগোলে যে-সব জায়গার নাম পড়েছি, সেখানে সত্যি সত্যি কোনওদিন বেড়াতে গেলে কী রকম যে অদ্ভুত ভাল লাগে, কী বলব!

আগে চাকরি করার সময় কাকাবাবু যখন বাইরে বাইরেই ঘুরতেন, তখন আমরা ওঁকে বেশি দেখতে পেতাম না। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকেন। বই পড়েন দিনরাত, আর বছরে একবার দুবার নানান ঐতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে যান-তখন আমাকে নিয়ে যান সঙ্গে। কাশ্মীরে এর আগেও কাকাবাবু দু তিন বার এসেছেন—এখানে অনেকেই চেনেন কাকাবাবুকে।

ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। দু হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি এসেও কিন্তু আমরা বাস ধরতে পারলুম না। সোনমার্গ যাবার প্রথম বাস একটু আগে ছেড়ে গেছে। পরের বাস আবার একঘণ্টা বাদে। অপেক্ষা করতে হবে।

কাকাবাবু, কিন্তু বিরক্ত হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন কী সন্তু, জিলিপি হবে নাকি?

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলুম। কাকাবাবু যে এক এক সময় মনের কথাটা ঠিক কী করে বুঝতে পারেন! পহলগ্রামে যারা বেড়াতে যায়নি, তারা বুঝতেই পারবে না, এখানকার জিলিপির কী অপূর্ব স্বাদ! খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মস্ত বড় মৌচাক সাইজের জিলিপি। টুসটুসে রসে ভর্তি, ঠিক মধুর মতন। ভেজাল ঘি কাশ্মীরে যায় না, ডালডা। তো বিক্রিই হয় না।

সোনার খোঁজে, না গন্ধকের খোঁজে?

বাস স্ট্যান্ডের কাছেই সোহনপালের বিরাট মিষ্টির দোকান। ভেতরে চেয়ার টেবিল পাতা, দেয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া। খাবারের দোকানের ভেতরে কেন যে আয়না দেওয়া বুঝি না। খাবার খাওয়ার সময় নিজের চেহারা দেখতে কারুর ভাল লাগে নকি? জিলিপিতে কামড় বসাতেই হাত দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ল।

অর্ডার দিয়েছেন। এক ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে তো! কাশ্মীরে এসে যতই পেট ভরে খাও, একটু বাদেই আবার খিদে পাবে। এখানকার জলে সব কিছু তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়।

কী প্রোফেসার সাহেব, আজ কোনদিকে যাবেন?

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এঁকে, নাম সূচা সিং। প্রায় ছ। ফিট লম্বা, কব্জি দুটো আমার উরুর মতন। চওড়া, মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি। সূচা সিং এখানে অনেকগুলো বাস আর ট্যাক্সির মালিক, খুব জবরদস্ত ধরনের মানুষ। কী কারণে যেন উনি আমার কাকাবাবুকে প্রোফেসার বলে ডাকেন, যদিও কাকাবাবু কোনওদিন কলেজে পড়াননি। কাকাবাবু আগে দিল্লিতে গভর্নমেন্টের কাজ করতেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কাশ্মীরে এসে প্রথম কয়েকদিনই অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলুম, এখানে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে, আশ্চর্য ব্যাপার, না? কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এর কারণ। কাকাবাবু বলেছিলেন, ভ্রমণকারীদের দেখাশোনা করাই তো। কাশ্মীরের লোকদের প্রধান পেশা। আর ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি-বাঙালিরা খুব বেড়াতে ভালবাসে-তাই বাঙালিদের কথা শুনে শুনে এরা অনেকেই বাংলা শিখে নিয়েছে। যেমন, সাহেব মেম অনেক আসে বলে এরা ইংরাজিও জানে বেশ ভালই। এখানেই একটা

ঘোড়ার সাহসকে দেখেছি, বাইশ তেইশ বছর বয়সে, সে কোনওদিন ইস্কুলে পড়েনি, নিজের নাম সই করতেও জানে না-অথচ ইংরেজি, বাংলা, উরদু বলে জলের মতন।

সূচা সিং ভাঙা ভাঙা উরিদু আর বাংলা কথা মিলিয়ে বলেন। কিন্তু উরদু তো আমি জানি না, তদুরক্তি, তাকালুফ। এই জাতীয় দু চারটে কথার বেশি শিখতে পারিনি।তাই ওর কথাগুলো আমি বাংলাতেই লিখব।

কাকাবাবু সূচা সিংকে পছন্দ করেন না। লোকটির বড় গায়ে পড়া ভাব আছে। কাকাবাবু একটু নির্লিপ্তভাবে বললেন, কোনদিকে যাব ঠিক নেই। দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

সূচা সিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, চলুন, কোনদিকে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, তার দরকার নেই। আমরা একটু কাছাকাছি ঘুরে আসব।

আমার তো গাড়ি যাবেই, নামিয়ে দেব আপনাদের।

না, আমরা বাসে যাব।

সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন। আমার একটা ভ্যান যাচ্ছে। ওটাতে যাবেন, আবার ফেরার সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন।

প্রস্তাবটা এমন কিছু খারাপ নয়। সূচা সিং বেশ আন্তরিকভাবেই বলছেন, কিন্তু পাত্তা দিলেন না। কাকাবাবু। হাতের ভঙ্গি করে সূচা সিং-এর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, না, কোনও দরকার নেই।

কাকাবাবু যে সূচা সিংকে পছন্দ করছেন না এটা অন্য যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সূচা সিং-এর সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। চেয়ারটা কাকাবাবুর কাছে টেনে এসে

খাতির জমাবার চেষ্টা করে বললেন, আপনার এখানে কোনও অসুবিধা কিংবা কষ্ট হচ্ছে না তো? কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন?

কাকাবাবু বললেন, না না, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

চা খাবেন তো? আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খান।

কাকাবাবু সংক্ষেপে বললেন, আমি চা খেয়েছি, আর খাব না।

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন। আমি এর মানে জানি। আমি লক্ষ করেছি, সূচা সিং সিগারেট কিংবা চুরুটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য করতে পারেন না। কাকাবাবু ওঁকে সরাবার জন্যই চুরুট ধরলেন। সূচা সিং কিন্তু তবু উঠলেন না-নাকটা একটু কুঁচকে সামনে বসেই রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, প্রোফেসার সাব, কিছু হদিস পেলেন?

কাকাবাবু বললেন, কী পাব?

যা খুঁজছেন এতদিন ধরে?

কাকাবাবু অপলকভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সূচা সিং-এর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, কিছুই পাইনি। বোধহয় কিছু বোধহয় পাওয়া যাবেও না।

তাহলে আর খোঁড়া পা নিয়ে এত তাকলিফ করছেন কেন?

তবু খুঁজছি, কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা।

আপনারা বাঙালিরা বড় অদ্ভুত। আপনি যা খুঁজছেন, সেটা খুঁজে পেলে তা তো গভর্নমেন্টেরই লাভ হবে। আপনার তো কিছু হবে না। তাহলে আপনি গভর্নমেন্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন? গভর্নমেণ্টকে বলুন, লোক দেবে, গাড়ি দেবে, সব ব্যবস্থা করবে–আপনি শুধু খবরদারি করবেন।

কাকাবাবু হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সূচা সিং-এর দিকে। তারপর বললেন, এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয়! গভর্নমেন্ট সব ব্যবস্থা করবে, তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তখন সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না?

লজ্জা কী আছে, গভর্নমেন্টের তো কত টাকারই শ্রাদ্ধ হচ্ছে; কম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল!

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন সিংজী! বাঙালিরা ভারি অদ্ভুত। তারা নিজেদের ভাল মন্দ বোঝে না।

সূচা সিং বললেন, আপনাকে দেখেই বুঝেছি, আপনি ভাল আদমি, কিন্তু একদম চালাক নন।

একটা কথা আগে বলা হয়নি, কাকাবাবু কাশ্মীরে এসেছেন গন্ধকের খনি খুঁজতে। কাকাবাবুর ধারণা, কাশ্মীরের পাহাড়ের নীচে কোথাও প্রচুর গন্ধক জমা আছে। কাশ্মীর সরকারকে জানিয়েছেন সে কথা। সরকারকে না জানিয়ে তো কেউ আর পাহাড় পর্বত মাপামাপি করতে পারে না-বিশেষত কাশ্মীরের মতন সীমান্ত এলাকায়। আমি আর কাকাবাবু তাই গন্ধকের খনি আবিষ্কার করার কাজ করছি।

সূচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এখানে পাহাড়ের নীচে সোনার খনি আছে। সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারেন

কাকাবাবু খানিকটা নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, আপনি জানেন, এখানে সোনা পাওয়া যাবে?

ডেফিনিটলি। আমি খুব ভালভাবে জানি।

আপনি যখন জানেনই যে এখানে সোনা আছে, তাহলে আপনিই সেটা আবিষ্কার করে ফেলুন না।

আমার যে আপনাদের মতন বিদ্যে নেই। ওসব খুঁজে বার করা আপনাদের কাজ। আমি তো শুনেছি, টাটা কম্পানির যে এত বড় ইস্পাতের কারখানা, সেই ইস্পাতের খনি তো একজন বাঙালিই আবিষ্কার করেছিল?

কাকাবাবু চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন, কিন্তু সিংজী, সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কী লাভ হবে! সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেন্টের হয়। গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবে।

সূচা সিং উৎসাহের চোটে টেবিলে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, নিক না। গভর্নমেন্ট! তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি! আমি আপনাকে সাহায্য করব। এখানে মুস্তফা বশীর খান বলে একজন বুড়ো আছে, খুব ইমানদার লোক। সে আমাকে বলেছে, মার্তিণ্ডের কাছে তার ঠাকুদা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল।

আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান।

আরো শুনুন, শুনুন, প্রোফেসারসাব-

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, ওঠ সন্তু। আমাদের বাসের সময় হয়ে এসেছে! তোর খাওয়া হয়েছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। একটু জল খাব।

খেয়ে নে। ফ্লাস্কে জল ভরে নিয়েছিস তো? তারপর কাকাবাবু সূচা সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি ধারণা, মাটির তলায় আস্ত আস্ত সোনার চাই পাওয়া যায়? পাথরের মধ্যে সোনা পাওয়া গেলেও তা গালিয়ে বার করা একটা বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া সাধারণ লোক ভাবে সোনাই সবচেয়ে দামি জিনিস। কিন্তু তুমি ব্যবসা করো-তোমার তো বোঝা

উচিত, অনেক জিনিসের দাম সোনার চেয়েও বেশি-যেমন ধরে কেউ যদি একটা পেট্রোলের খনির সন্ধান পেয়ে যায়-সেটার দাম সোনার খুনির চেয়েও কম হবে না। তেমনি, গন্ধক শুনে হেলাফেলা করছি, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি প্রচুর পরিমাণে সালফার ডিপোজিটর খোঁজ পাওয়া যায়–

সে তো হল গিয়ে যদি-র কথা। যদি গন্ধক থাকে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কাশ্মীরে সোনা আছেই!

তাহলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও! আয় সন্তু–

সূচা সিং হঠাৎ খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, কী খোকাবাবু, কোনদিকে যাবে আজ?

সূচা সিং-এর বিরাট হাতখানা যেন বাঘের থাবা, তার মধ্যে আমার ছোট্ট হাতটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকলাম। কাকাবাবু বললেন, আজ আমরা দূরে কোথাও যাব না, কাছাকাছিই ঘুরব।

সূচা সিং আমাকে আদর করার ভঙ্গি করে বললেন, খোকাবাবুকে নিয়ে একদিন আমি বেড়িয়ে আনব। কী খোকাবাবু, কাশ্মীরের কোন কোন জায়গা দেখা হল? আজ যাবে আমার সঙ্গে? একদম শ্রীনগর ঘুরিয়ে নিয়ে আসব?

শ্রীনগরের নাম শুনে আমার একটু একটু লোভ হচ্ছিল, তবু আমি বললাম, না।

সূচা সিং-এর হাত ছাড়িয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সূচা সিং-ও এলেন পেছনে পেছনে। আমরা তখন বাস স্ট্যান্ডের দিকে না গিয়ে হটিতে লাগলাম। অন্যদিকে।

কাকাবাবু সূচা সিংকে মিথ্যে কথা বলেছেন। আমরা যে আজ সোনমার্গে যাব, তা তো সকাল থেকেই ঠিক আছে। কাকাবাবু সূচা সিংকে বললেন না সে কথা। গুরুজনরা যে কখনও মিথ্যে কথা বলেন না, তা মোটেই ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বলেন। যেমন, আর একটা কথা, কাকাবাবু অনেককে বলেছেন বটে যে তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার

করতে এসেছেন-কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। কাকাবাবু হয়তো ভেবেছেন, ছেলেমানুষ বলে আমি সব কিছু বিশ্বাস করব। কিন্তু আমি তো ততটা ছেলেমানুষ নই। আমি এখন ইংরিজি গল্পের বইও পড়তে পারি। কাকাবাবু অন্য কিছু খুঁজছেন। সেটা যে কী তা অবশ্য আমি জানি না। সূচা সিংও কাকাবাবুকে ঠিক বিশ্বাস করেননি। সূচা সিং-এর সরকারি মহলের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা, সেখান থেকে কিছু শুনেই বোধহয় সূচা সিং সুযোগ পেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন। সূচা সিং-এর কি ধারণা, কাকাবাবু গন্ধকের নাম করে আসলে সোনার খনিরই খোঁজ করছেন? আমরা কি সত্যিই সোনার সন্ধানে ঘুরছি?

সূচা সিং-এর দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা চলে এসেছি খানিকটা দূরে। রোদ উঠেছে। বেশ, পথে এখন অনেক বেশি মানুষ। আজ শীতটা একটু বেশি পড়েছে। আজ সুন্দর বেড়াবার দিন।

বাসের এখনও বেশ খানিকটা দেরি আছে। সূচা সিং-এর জন্য আমরা রাস ডিপোতে যেতেও পারছি না। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কাকাবাবু আপনমনে চুরুট টেনে যাচ্ছেন। আমি একটা পাথরের টুকরোকে ফুটবল বানিয়ে সুট্ দিচ্ছিলাম—-

হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আরেঃ, স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিণি-

জিজ্ঞেস করলেন, কে ওরা?

উত্তর না দিয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, এই স্নিগ্ধাদি!

এক ডাকেই শুনতে পেল। ওরাও আমাকে দেখে অবাক। এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আমি কাকাবাবুকে বললাম— কাকাবাবু, তুমি ছোড়দির বন্ধু স্নিগ্ধাদিকে দেখোনি?

উৎসাহে আমার মুখ জ্বলজ্বল করছে। এতে দূরে হঠাৎ কোনও চেনা মানুষকে দেখলে কী আনন্দই যে লাগে। কলকাতায় থাকতেই অনেকদিন গিন্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়নি।আর

আজ হঠাৎ এই কাশ্মীরে! বিশ্বাসই হয় না! কাকাবাবু কিন্তু খুব একটা উৎসাহিত হলেন না। আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখলেন।

স্নিগ্ধাদি আমার ছোড়দির ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে। ছোড়াদির বিয়ে হবার ঠিক এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল স্নিগ্ধাদির। স্নিগ্ধাদির বিয়েতে আমি ধুতি পরে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে সেই প্রথম ধুতি পরা। সিদ্ধার্থদাকেও আমরা আগে থেকে চিনি, ছোড়দিদের কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমাদের পাড়ার ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন। স্নিগ্ধাদির সঙ্গে সিদ্ধার্থদার বিয়ে হবার পর একটা মুস্কিল হল। স্নিগ্ধাদিকে স্নিগ্ধা বৌদি বলে ডাকতে হয়, কিংবা সিদ্ধার্থদাকে জামাইবাবু। আমি কিন্তু তা পারি না। এখনও সিদ্ধার্থদা-ই বলি! আর রিণি হচ্ছে স্নিগ্ধাদির বোন আমারই সমান, ক্লাস এইট-এ পড়ে। পড়াশুনোয় এমনিতে ভালই, কিন্তু অঙ্কে খুব কাঁচা। কঠিন অ্যালজেব্রা তো পারেই না, জিওমেট্রি এত সোজা-তাও পারে না। তবে রিণি বেশ ভাল ছবি আঁকে।

স্নিগ্ধাদি কাছে এসে এক মুখ হেসে বললেন, কী রে সন্তু, তোরা কবে এলি, আর কে এসেছে? মাসীমা আসেননি? বনানীও আসেনি?

আমি বললাম, ওঁরা কেউ আসেনি। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছি।

কাকাবাবুর কথা শুনে ওরা তিনজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। কাকাবাবুকে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে কাকাবাবু তো দিল্লিতেই থাকতেন বেশির ভাগ-তাই স্নিগ্ধাদি দেখেননি আগে।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে বললেন, আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনি তো আরকিওলজিক্যাল সারভে-তে ডাইরেকটর ছিলেন? আমার এক মামার সঙ্গে আপনার-

কাকাবাবুর কথাবার্তা বলার যেন কোনও উৎসোহই নেই। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করো?

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমি কলকাতায় একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই।

কাকাবাবু সিদ্ধার্থদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইতিহাস পড়াও? তোমার সাবজেক্ট কী ছিল? ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি?

সিদ্ধার্থদা বিনীতভাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি বৌদ্ধ আমল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি।

কাকাবাবু বললেন, ও, বেশ ভাল। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগল। এবার আমাদের যেতে হবে। চল সন্তু-

সিদ্ধার্থদা বললেন, আপনারা কোনদিকে যাবেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমি অধীর আগ্রহে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। কাকাবাবু যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে কী ভালই যে হয়! রোজই তো পাথর মাপামাপি করি, আজ একটা দিন যদি সবাই মিলে বেড়ানো যায়! তা ছাড়া, হঠাৎ স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নাঃ, তোমরাই ঘুরে টুরে দ্যাখো। পহলগ্রাম বেশ ভাল জায়গা। আমরা অন্য জায়গায় যাব, আমাদের কাজ আছে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, তা হলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে!

সিন্ধাদি বললেন, সন্তু, তুই তো এখানে কয়েকদিন ধরে আছিস। তুই তা হলে আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে টুরে দ্যাখা। আমরা তো উঠেছি। শ্রীনগরে, এখানে একদিন থাকব-

আমি উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, স্নিগ্ধাদি, শ্রীনগর কী রকম জায়গা?

স্নিগ্ধাদি বললেন, কী চমৎকার, তোকে কি বলব। এত ফুল, আর আপেল কী শস্তা? তোরা এখনও যাসনি ওদিকে?

না!

এত সুন্দর যে মনে হয়, ওখানেই সারা জীবন থেকে যাই।

আমি একটু অহংকারের সঙ্গে বললাম, পহলগ্রামও শ্রীনগরের চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। এখানে কাছাকাছি আরও কত ভাল জায়গা আছে!

রিণি বলল, এই সন্তু, তুই একটু রোগ হয়ে গেছিস কেন রে? অসুখ করেছিল?

আমি বললাম, না তো!

তা হলে তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

ভ্যাট! মোটেই না।

নদীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিণি জিজ্ঞেস করল, এই নদীটার নাম কি রে?

আমি বললাম, এটার নাম হচ্ছে লীদার নদী। আগেকার দিনে এর সংস্কৃত নাম ছিল লম্বোদরী। লম্বোদরী থেকেই লোকের মুখে মুখে লীদার হয়ে গেছে। আবার অমরনাথের রাস্তায় এই নদীটিকেই বলে নীল গঙ্গা।

স্নিগ্ধাদি হাসতে হাসতে বললেন, সন্তুটা কী রকম বিজ্ঞের মতন কথা বলছে! ঠিক পাকা গাইডদের মতন...

আমি বললাম, বাঃ, আমরা তো এখানে দুঃ সপ্তাহ ধরে আছি। সব চিনে গেছি। আমি এক একা তোমাদের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তু, তুমি কি তাহলে এদের সঙ্গে থাকবে? তাই থাকো না হয়-

আমি চমকে কাকাবাবুর দিকে তাকলাম। কাকাবাবুর গলার আওয়াজটা যেন একটু অন্য রকম। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা কান্নাকান্না ভাব এসে গেল। কাকাবাবু নিশ্চয়ই

আমার ওপরে অভিমান করেছেন। তাই আমাকে থাকতে বললেন। আমি তো জানি, খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা একলা কোনও কাজই করতে পারবেন না। সাহায্যও নেবেন না। অন্য কারুর।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

কাকাবাবু তবু বললেন, না, তুমি থাকো না। আজ একটু বেড়াও ওদের সঙ্গে। আমি একলাই ঘুরে আসি।

আমি জোর দিয়ে বললাম, না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

কাকাবাবুর মুখখানা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন, চলো তাহলে। আর দেরি করা যায় না।

আমি সিদ্ধার্থদাকে বললাম, আপনারা এখানে কয়েকদিন থাকুন না। আমরা তো আজ সন্ধেবেলাতেই ফিরে আসছি।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাব–

সেই অমরনাথ মন্দির পর্যন্ত যাবেন? সে তো অনেকদিন লাগবে!

স্নিগ্ধাদি বললেন, ঐ রাস্তায় যাব, যতটা যাওয়া যায়-খুব বেশি কষ্ট হলে যাব না বেশিদূর। ফিরে এসে তোদের সঙ্গে দেখা হবে। তোরা কি এখানেই থাকছিস?

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এখানে কতদিন থাকবেন?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক নেই।

বাস এসে গেছে। আমি আর কাকাবাবু বাসে উঠে পড়লাম। চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি আর রিণি হেঁটে যাচ্ছে লীদার নদীর দিকে। রিণি তরতরিয়ে এগিয়ে গিয়ে নদীটির জলে পা ডোবাল।

আকাশ পুরনো হয় না

সোনমার্গেও আজ বেশ ভিড়। প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। বরফের ওপরে স্কেটিং করছে, লাফাচ্ছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে অনেকে। বরফের ওপর লাফালাফি করার কী মজা, পড়ে গেলেও একটুও ব্যথা লাগে না, জামা কাপড় ভেজে না। এমনকী শীতও কম লাগে। এখানকার হাওয়াতেই বেশি শীত। একটা মেয়ে-ইস্কুল থেকে দল বেঁধে বেড়াতে এসেছে, এক রকম পোশাক পরা গোটা চল্লিশোক মেয়ে, কী হুড়োহুড়িই করছে সেখানে। আর দুজন সাহেব মেম মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে অনবরত।

আমরা অবশ্য ওদিকে যাব না। আমাদের খেলাধুলো করার সময় নেই। কাকাবাবু কাশ্মীরের ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আমাকে বললেন, চলো।

কাশ্মীরে এসে একটা লাভ হয়েছে, আমি বেশ ভাল ঘোড়ায় চড়তে-পারি এখন! প্রথম দু একদিন অবশ্য ভয় ভয় করত, গায়ে কী ব্যথা হয়েছিল! এখন সব সেরে গেছে। এখন ঘোড়া গ্যালিপ করলেও আমার অসুবিধে হয় না। প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গেই একটা করে পাহারাদার ছেলে থাকে, আমি আমার সঙ্গের ছেলেটাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাই।

সেই নির্জন পাহাড়ের ওপর দিয়ে একলা একলা ঘোড়া চালাতে চালাতে নিজেকে মনে হয় ইতিহাসের কোনও রাজপুত্রের মতন। অন্য কারুকে অবশ্য এ কথাটা বলা যায় না, নিজের মনে মনেই ভাবি। যেন আমি কোন এক নিরুদেশের দিকে যাত্রা করেছি।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোড়া চালিয়ে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলুম। এখানে কিছু নেই, সব দিক ফাঁকা, এদিকে ওদিকে থোকা থোকা বরফ ছড়ানো, মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। তিনদিক ঘিরে আছে বিশাল বিশাল পাহাড়-মেঘ ফুড়ে আরও

উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চুড়া। এক দিকে ঢালু। হয়ে বিশাল খাদ, অনেক নীচে দেখা যায় কিছু গাছপালা আর একটা গ্রামের মতন।

এই পাহাড়টাতেও আমরা আগে একবার এসেছি, দিন আষ্টেক আগে। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, অনেকটা টিপির মতন-আরও দুটো পাহাড় পেরিয়ে এটায় আসতে হয়। দু চারটি বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ আছে এ পাহাড়ে-পাইন গাছগুলোর ওপর বরফ পড়ে আছে, ঠিক যেন বরফের ফুল ফুটেছে। এখানে আবার নতুন করে মাপামাপি করার কী আছে কে জানে। সব দিকেই তো শুধু বরফ ছড়ানো। বরফ না খুঁড়লে কী করে বোঝা যাবে নীচে কী আছে? আর এই বরফের নীচে কি গন্ধক পাওয়া সম্ভব? কিংবা সোনা?

কাকাবাবু ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে ছুটি দিয়ে দিলেন। বললেন বিকেলবেলা আসতে। ঘোড়া দুটো বাঁধা রইল। আমাদের সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ। আর ফ্লাস্কে কফি আছে-আমাদের আর খাবারদাবারের জন্য নীচে নামতে হবে না!

ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে কাকাবাবু তার ওপর বসলেন। তারপর ওভারকেটের পকেট থেকে একটা হলদেটে, পোকায়-খাওয়া পুরনো বই বার করে দেখতে শুরু করলেন। আমাকে বললেন, সন্তু, তুমি ততক্ষণ চারপাশটা একটু দেখে নাও—একটু পরে কাজ শুরু করা যাবে।

আমার মন খারাপ ভাবটা তখনও যায়নি। একটু ক্ষুন্নভাবে বললাম, কাকাবাবু, এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি। আজ আর নতুন করে কী দেখব?

কাকাবাবু বই থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল। ঐ সিদ্ধার্থদের সঙ্গে বেড়াতে? তা তো হবেই, ছেলেমানুষ-

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না, না, আমি কাজ করতেই চাই। এখন কাজ শুরু হবে না?

কাকাবাবু আমার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, কোনও কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভাল করে দেখে নিতে হয়। শোনো, দেখার জিনিসের কোনও শেষ নেই। কোনও জায়গাতে গিয়েই কখনও ভাববে না, দেখার কিছু নেই। সেই জায়গায়। খোলা চোখ নিয়ে তাকালেই অনেক কিছু দেখতে পাবে। যেমন ধরে আকাশ। আকাশ কি কখনও পুরনো হয়? কোনও মানুষ সারাজীবনে এক রকমের আকাশ দুবার দেখে না। প্রত্যেকদিন আকাশের চেহারা অন্যরকম। এই পাহাড়ও তাই। কখনও রোদ্দুর, কখনও ছায়-অমনি পাহাড়গুলোর চেহারা বদলে যায় না? একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো-তাহলেই বুঝতে পারবে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা আজ সত্যিই খুব সুন্দর। হালকা তুলোর মতন মেঘ বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছে। সেই মেঘগুলোর চেয়ে আরও উঁচুতে আবার ঘন কালো রঙের মেঘ-অথচ রোদ্দুরও হয়েছে। রিণিদের সঙ্গে যদি দেখা না হত, বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে না জগত-তাহলে এই আকাশের দিকে তাকালে ভালই লগত।

কাকাবাবু বইটা পড়তে লাগলেন, আমি পাহাড়ের উল্টোদিকে একটুখানি নেমে গেলাম। এখানে একটা ছোট্ট গুহা আছে। গুহার মুখটা বেশ বড়, কিন্তু বেশি গভীর নয়। আগে বইতে পাহাড়ের গুহার কথা পড়লেই মনে হত, সেটা হবে অন্ধকার-অন্ধকার, বাদুড়ের গন্ধ আর হিংস্র পশুর বাসা। সেদিক থেকে এই গুহাটা দেখলে নিরাশই হতে হয়। কাশ্মীরে হিংস্র জীবজন্তু বিশেষ নেই। গুহাটা বেশ ঝকঝকে তকতকে। এক জায়গায় একটা ভাঙা উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ। মনে হয় এইখানে এক সময় কেউ ছিল। এতদূরে কেউ তো আর পিকনিক করতে আসবে না। বোধহয় কোনও সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন কোনও সময়।

গুহাটার মধ্যে একটু বসেছি আমনি বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে লাগল। আমিও ছুটে বাইরে এলাম। বরফ পড়ার সময় ভারী মজা লাগে। ছেড়া ছেড়া তুলোর মতন হালকা বরফ, গায়ে পড়লেও জামাকাপড় ভেজে না-হাতে জমিয়ে-জমিয়ে শক্ত বলের মতনও

বানানো যায়। বরফের মধ্যে খানিকটা দৌড়োদৌড়ি করে আমি শীত কমিয়ে নিলাম। তারপরে হাঁটুগেড়ে বসে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমিয়ে মন্দির বানাতে লাগলাম একটা।

কাকাবাবুও নেমে এসেছেন। বললেন, এসো এবার কাজ শুরু করা যাক। খানিকটা কাজ করে তারপরে আমরা খেয়ে নেব। তোমার খিদে পায়নি তো?

না, এক্ষুনি কী খিদে পাবে।

বেশ। ফিতেগুলো বার করে।

ব্যাগ দুটো আমি গুহার মধ্যে রেখেছিলাম। সেগুলো নিতে এলাম, কাকাবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। গুহার চার পাশটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ। এইটার জন্যই এখানে আসি।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, ককাবাবু, আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না? তাহলে বেশ মজা হবে।

কাকাবাবু বললেন, এখানে কি থাকা যায়? শীতে মরে যাব। সামনেটা তো খোলা-যখন বরফের ঝড় উঠবে।

কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো এই রকম গুহাতেই থাকে।

সন্ন্যাসীরা যা পারে, তা কি আমরা পারি! সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে গুহার দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন।

চিন্তিতভাবে বললেন, এই গুহার কোনও জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে? মনে তো হচ্ছে না।

আমি কিছু বললাম না। পাথর আবার কখনও ফাঁপা হয় নাকি?

কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ গুহাটা পরীক্ষা করলেন। মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন। তারপর নিরাশ ভাবে বললেন, নাঃ, এখানে কিছু আশা নেই।

কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে কী যে পাবার আশা করেছিলেন, তা-ও বুঝতে পারলাম না আমি।

আর সময় নষ্ট না করে আমরা মাপার কাজ শুরু করলাম। এই মাপার কাজটা ঠিক যে পর পর হয় তা নয়। কাকাবাবু ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন, আর একটা দিক ধরে আমি নেমে যাই, যতক্ষণ না ফিতেটা শেষ হয়। সেখানে আমি পা দিয়ে একটা দাগ কাটি। কাকাবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, এবার ডান দিকে যাও! ডানদিকটা হয়ে গেলে কাকাবাবু হয়তো বলেন, এবার বা দিকে যাও অর্থাৎ, কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি চারদিকে ঘুরতে থাকি। তারপর কাকাবাবু আবার খানিকটা এগিয়ে যান, আমি আবার মাপতে শুরু করি!

সত্যি কথা বলতে কী, এরকমভাবে মাপায় যে কোনওরকম কাজ হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি! আমি ক্লান্ত হয়ে যাই, কাকাবাবু কিন্তু ক্লান্ত হন না। দিনের পর দিন এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ফেরার পর স্কুলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে। এতদিন কাশ্মীরে থেকে কী করলি? আমি যদি বলি, আমি শুধু কাকাবাবুর সঙ্গে পাথর মেপে এলাম–তা হলে কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে? কিংবা হয়তো হাসবে!

ঘণ্টা দু-এক বাদে আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম-ৰ পাহাড়টার চুড়া থেকে আমরা অনেকটা নীচে চলে এসেছি। পাহাড়ের নীচের গ্রামটা এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, রুপোর তারের মতন একটা নদী!

কাকাবাবু বললেন, ডানদিকে দ্যাখে। উপত্যকা দেখতে পাচ্ছ?

ডানদিকে আর একটা খাড়া পাহাড়, তার নীচে ছোট্ট উপত্যক। সেই উপত্যকায় অনেকটা বেশ পরিষ্কার জমি। ঠিক যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সেখানে কয়েকটা কী যেন জন্তু নড়াচড়া করছে। এত দূরে যে ভাল করে দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, ওগুলো কি জন্তু বুঝতে পারছ?

না, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কুকুর। নাকি হরিণ ওগুলো? কাকাবাবুর কাছে সব সময় ছোট একটা দূরবীন থাকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ভাল করে দ্যাখো।

দূরবীন চোখে দিয়েই দেখতে পেলাম, কুকুর কিংবা হরিণ না, কতগুলো ঘোড়া সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে একটাও মানুষজন নেই।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, কাকাবাবু, ওগুলো কি বুনো ঘোড়া? ওদের কখনও কেউ ধরেনি?

কাকাবাবু বললেন, না। ঠিক তার উল্টো। আমি অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। ঘোড়ার উল্টো মানে কি? মেয়ে-ঘোড়া? মেয়ে ঘোড়াকে কি ঘুড়ী বলে? ঠিক জানি না। ইংরেজিতে বলে মেয়ার?

কাকাবাবু, ওগুলো কি তবে মেয়ার?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, না, তা বলিনি। ওগুলো বুনো ঘোড়া নয়, ওগুলো বুড়ো ঘোড়া। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেতো ঘোড়া।

ওগুলো সব বুড়ো ঘোড়া? এক সঙ্গে এত বুড়ো ঘোড়া কোথা থেকে এল? তুমি কী করে জানলে?

আমি আগেও দেখেছি। এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায়। এইগুলো হচ্ছে ঘোড়াদের কবরখানা। এই সব পাহাড়ী জায়গাতে তো বুড়ো ঘোড়া কোনও কাজে লাগে

না, তাই ঘোড়াগুলো খুব বুড়ো হয়ে গেলে এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে উঠে আসতে পারবে না। ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন।

-ইস, কী নিষ্ঠুর! কেন, বাড়িতে রেখে দিতে পারে না?

নিষ্ঠুর নয়! বাড়িতে রেখে দিলে তো খেতে দিতেও হয়। এরা গরিব মানুষ, কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কারুকে খাওয়াতে পারে? তাই চোখের আড়ালে যাতে মরে যায়, তাই ছেড়ে দিয়ে আসে। নিজের হাতে মারতে হল না। বুড়ো ঘোড়ার কোনও দাম নেই, কেউ কিনবেও না। এদেশে তো কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না।তাহলে বাজারে বিক্রি হতে পারত। ফ্রান্সে ঘোড়ার মাংস খায়-

ঘোড়াগুলো ওখানে থেকে মরার জন্য প্রতীক্ষ্ণ করছে-একথা ভেবেই আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ততদিন ওদের যত্ন ছিল। মানুষ বড় স্বার্থপর! মানুষও তো খুব বুড়ো হয়ে গেলে আর কাজ করতে পারে না। তখন কি তাদের কেউ ওরকমভাবে ছেড়ে দিয়ে আসে?

আমি দূরবীনটা নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। এবার দেখতে পেলাম, ঐ উপত্যকার এখানে-সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে। আগে যারা মরেছে। যে-ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলোও খুব রোগা রোগা। খাবার কিছুই নেই বোধহয়। ঘোড়ারা কি আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, নাও, আবার কাজ শুরু করা যাক।

আমি ফিতের বাক্স নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

এর পরেই একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই বরফে ক্রাচ পিছলে গেল। কাকাবাবু মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবুকে ধরার জন্য আমি হাতের জিনিস ফেলে ছুটতে যাচ্ছিলাম; কাকাবাবু সেই অবস্থায় থেকেই আমাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই সন্তু দৌড়বি না! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়তে নেই। আমি নিজেই উঠছি!

আমি থমকে দাঁড়ালাম। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। ক্রীচটা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আবার পড়ে গেলেন। এবার পড়েই গড়াতে লাগলেন নীচের দিকে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। এবার আমি দৌড়াতেও সাহস পেলাম না। নীচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কাকাবাবু গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন– সেই ঘোড়াদের কবরখানার দিকে। কাকাবাবু দুহাত দিয়ে প্রাণপণে কিছু একটা চেপে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরার কিছু নেই, একটা গাছ বা লতাপাতাও নেই। আমার বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। কী হবে? এখন কী হবে? আমি একবার পাঁচ ছটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছিলাম আমার বাড়িতে...। কিন্তু এ তো হাজার হাজার সিঁড়ির চেয়েও নিচু...

খানিকটা দূরে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। সেখানেও গাছপালা কিছু নেই, কী ধরে কাকাবাবু থামলেন জানি না। থেমে গিয়ে কাকাবাবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। এবার আর কিছু না ভেবে আমি দৌড় লাগালাম কাকাবাবুর দিকে। সব সময় তো আর সাবধান হওয়ার কথা মনে থাকে না! দৌড়েই বুঝতে পারলাম, কী দারুণ ভুল করেছি! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়তে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না। আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে!

কাকাবাবুর কাছাকাছি গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। ওঁর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু!

কাকাবাবু মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, বললাম না, পাহাড়ের নীচের দিকে দৌড়তে নেই! আর কক্ষনো এ রকম করবে না!

সে কথা অগ্রাহ্য করে আমি বললাম, কাকাবাবু, তোমার লাগেনি তো?

তোমার লেগেছে কি না বলো?

না, আমার কিছু হয়নি। তুমি-তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে–

ও কিছু না। ওতে কিছু হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেলাম। কাকাবাবু আমার হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা, কিন্তু মনের জোর অসাধারণ। এমন ভাব করলেন, যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু চোখে হাত দিয়েই কাকাবাবু বললেন, এই যা! আমার চশমা?

চশমা ছাড়া কাকাবাবু চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। খুব কাছ থেকেও মানুষ চিনতে পারেন না। গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবুর চশমাটা কোথাও হারিয়ে গেছে। কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

হারিয়ে গেলে যদি অসুবিধেয় পড়তে হয়, সেই জন্য কাকাবাবুর এক জোড়া চশমা থাকে। আর একটা আছে তাঁবুতে। আমি বললাম, যাক গে, কাকাবাবু, তোমার তো আর একটা চশমা আছে!

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু এখন আমি এতটা রাস্তা ফিরব কী করে? তা ছাড়া সেটাও যদি কোনওরকমে হারিয়ে যায়, তা হলে তো সব কাজই বন্ধ হয়ে যাবে! তুমি দাঁড়াও আমি চশমাটা খুঁজে দেখি!

সেই ঢালু পাহাড়ে এক পা উঠতে বা নামতেই ভয় করে–সেখানে চশমা খোঁজা যে কী শক্ত ব্যাপার, তা বলে বোঝানো যাবে না। কাকাবাবু আর আমি দুজনে দুজনকে ধরে রইলাম, তারপর খুঁজতে লাগলাম চশমা। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দেখা গেল, বরফের মধ্যে সেটা গেথে আছে, একটা ডাঁটি ভাঙা-আর কোনও ক্ষতি হয়নি।

হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। কাকাবাবু যদি তখন সত্যি সত্যি পড়ে যেতেন, আমি একলা এখানে কী করতাম? কাকাবাবুকে ফেলে আমি ফিরেও যেতে পারতাম না, কিংবা একলা একলা

আমি আবার বসে পড়ে বললাম, কাকাবাবু, আমার এই কাজ ভাল লাগে না!

কাকাবাবু বললেন, ভাল লাগে না? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজা করে বসে রইলাম। সত্যি আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু কাকাবাবুকে আমি তা দেখতে দিইনি।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও!

আর তুমি কী করবে? তুমি এখানে একলা একলা থাকবে?

হ্যাঁ। আমি থাকব। আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি, সেটা শেষ না করে যাব না।

সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে যাবার কথা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবুকে একলা ফেলে যেতেও ইচ্ছে করে না। কাকাবাবু একলা একলা পাহাড়ে ঘুরবেন– কাকাবাবুকি ভাবছেন, আমি নিজের কষ্টের কথা ভেবে চলে যেতে চাইছি? মোটেই তা নয়! কাকাবাবুর জন্যই তো আমার চিন্তা হচ্ছে।

আমি বললাম, কাকাবাবু আমি তোমার সঙ্গেই থাকব, তোমার সঙ্গে ফিরব। কিন্তু ফিতে মাপার কাজ আমার ভাল লাগে না।

ঠিক আছে, কাল থেকে অন্য একটা কমবয়সী ছেলেকে ঠিক করব-সে ফিতে ধরবে, আর তুমি আমার পাশে থাকবে।

কিন্তু কাকাবাবু, আমরা কী খুঁজছি? কী হবে এই রকম ফিতে মেপে?

কাকাবাবু একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তুমি তো এখনও ছেলেমানুষ, এখন সব বুঝবে না। বড় হলে বুঝবে, আমরা যা খুঁজছি, যদি পাই, সেটা কত বড় আবিষ্কার!

তাহলে আরও লোকজন নিয়ে এসে ভাল করে খুঁজলে হয় না?

আমি বিশেষ কারুকে বলতে চাই না। কারণ যা খুঁজছি তা যদি শেষ পর্যন্ত না পাই, লোকে শুনে হাসাহসি করবে। পাবই যে তারও কোনও মানে নেই। সুতরাং চুপচাপ খোঁজাই ভাল, যদি হঠাৎ পেয়ে যাই, তখন সবাই অবাক হবে। তখন তোমাকেই সবাই বলবে বাহাদুর ছেলে?

কাকাবাবু, আমরা আসলে কী খুঁজছি? সোনা?

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, কী বললে, সোনা? না, না, সোনাটোনা কিছু নয়। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কেউ সোনা পায় নাকি? যত সব বাজে কথা।

তাহলে?

আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুয়ো। চৌবাচ্চাও বলতে পারো। কিন্তু সাধারণ চৌবাচ্চার থেকে অনেক গভীর। চলো, আজকের মতন ফেরা যাক।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাস্তায়

সেদিন সন্ধেবেলা পহলগ্রামে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে টের পেলাম, আমার বাঁ পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। কখন একটু মচকে গেছে টের পাইনি। আয়োডেক্স মালিশ করলাম বেশ করে। কাকাবাবু যদিও বললেন, তাঁর কিছু হয়নি, তবুও আমি ওঁর দু পায়ে মলম মালিশ করে দিলাম।

বলতে ভুলে গেছি, এখানে সন্ধে হয় নটার সময়। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিকেলের আলো থাকে। প্রথম প্রথম ভারী অদ্ভুত লাগত। আমাদের রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও বাইরে তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো। আমাদের দেশেই কত জায়গায় কত যে আশ্চর্য সব ব্যাপার আছে। বই পড়ে এই পৃথিবীটাকে কিছুই চেনা যায় f r ।

সিদ্ধার্থদারা বলেছিলেন, ওঁরা আজকের রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকবেন। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব। কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্য যাওয়া হল না। হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। বিছানায় শুয়ে লীদার নদীর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা উঠে কাকাবাবুকে কিছু না বলেই আমি বেরিয়ে পড়লাম একলা-একলা। আজ কাকাবাবুর থেকেও আমি আগে উঠেছি। লীদার নদী পহলগ্রামে যেখানটায় ঢুকেছে, সেখানে একটা ছোট্ট কাঠের ব্রিজ। আমি ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধার্থদারা অমরনাথে যাবেন, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে।

একটু পরেই দেখা গেল ওঁদের। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আছেন, আর দুজন গাইড। সবাই ঘোড়ার পিঠে। স্নিগ্ধাদি আর রিণিকে তো চেনাই যায় না। ব্রীচেস, ওভারকোট,

মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, চোখে কালো চশমা। সিদ্ধার্থদাকেও বেশ মানিয়েছে, তবে সিদ্ধার্থদার ঘোড়াটা ওঁর তুলনায় বেশ ছোট।

স্নিগ্ধাদি আমাকে দেখেই বললেন, ওমা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আমরা ভাবলুম বুঝি তোর সঙ্গে আর দেখাই হল না। কাল সারাদিন কোথায় ছিলি?

সোনমার্গে ছিলাম।

ওখানে কী করলি? ওখানে তো দেখার কিছু নেই।

আমি চট্ট করে একটু আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যিই, আকাশটা রোজই নতুন হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে!

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমাদের এখানে অনেক কাজ আছে।

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কী? এখানেও স্কুলের হোম-টাস্ক করছ নাকি?

উত্তর দিলাম না। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। রিণিকে বললাম, শোন, মুখে অনেকটা করে ক্রিম মেখে নে। না হলে কিন্তু ভীষণ চামড়া ফাটে!

রিনি খিলখিল করে হেসে বলল, দিদি, দেখছ, সন্তু কী রকম বড়দের মতন কথা বলতে শিখেছে?

আহা, আমি তোদের থেকে বেশিদিন আছি না! আমি তো এসব জানবই!

তুই সত্যি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। তুই বেশ গাইড হাতিস আমাদের! জানিস, আমি অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। তোকে দেখানো হল না।

আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি ওদের সঙ্গে চলে যাই। যে-পোশাক পরে আছি, সেইভাবেই। কিন্তু তা হয় না। আমি একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললাম, অমরনাথে এমন কিছু দেখবার নেই। ওসব মন্দির-টন্দির দেখতে আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি তো চন্দনবাড়ি আর কোহলাই পর্যন্ত গিয়েছি একবার!

স্নিগ্ধাদি বললেন, হ্যাঁরে, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকিবি তো? আমাদের তো যাওয়া-আসা নিয়ে বড়জোর সাতদিন! কিংবা রাস্তা খারাপ থাকলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি!

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, থাকব। থাকব।

রিণি ঘোড়ার ওপর একটু ভীতু ভীতু ভাবে বসে ছিল। আমি ওকে বললাম, এই, ঠিক করে শক্ত হয়ে বোসী! প্রথম দিন একটু গায়ে ব্যথা হবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

রিণি বলল, যা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না! এলি না তো আমাদের সঙ্গে!

আমি বললাম, তোরা অমরনাথ থেকে ফিরে আয়-তখন অন্য কোথাও আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে বেড়াতে যাব।

তারপর ওরা এগিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলাম।

ক্যাম্পে ফিরেই আবার সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম বলে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একমনে ম্যাপ দেখছিলেন। এক সময় মুখ তুলে বললেন, সন্তু, আমি ঠিক করলাম, পহেলগ্রামে আমাদের আর থাকা হবে না। এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় যায়। সোনমার্গ থেকে কাল পাহাড়ের নীচে যে ছোট্ট গ্রামটা দেখলাম, ওখানে গিয়েই দিন দশেক থাকা যাক?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। পহলগ্রাম থেকেও চলে যেতে হবে? সিদ্ধার্থদা, রিণি, স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

আমি মুখ শুকনো করে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ গ্রামে থাকব? ওখানে থাকার জায়গা আছে?

কাকাবাবু আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, সে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালকে ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও ঐ গ্রামে থাকে। এটাই বেশ ভাল হবে। চেন্নাশুনো। কারুর সঙ্গে দেখা হবে না-নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে।

চেন্নাশুনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই খুশি হয়। কাকাবাবুর সব কিছুই অন্যরকম। ঐ ছোট্ট গ্রামে থাকতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। তবু পহেলগ্রামে কত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। এখন এ জায়গা ছেড়ে আবার কোন ধাদোড়া গোবিন্দপুরে যেতে হবে। কিন্তু কাকাবাবু একবার যখন ঠিক করেছেন, তখন যাবেনই!

কাকাবাবু বললেন, জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। বেশি দেরি করে আর ল্লাঊ দীঁ?

বাস-স্টপের কাছে আজও সূচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হল। বিশাল একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, কী খোকাবাবু, কাল সোনমার্গ কী রকম বেড়ানো হল?

তারপর হা-হা করে হেসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী প্রোফেসারসাব, কাল যে বললেন সোনমার্গ যাবেন না? আমি তো কাল দেখলাম, আপনারা সোনমার্গ থেকে ফিরছেন বিকেলে!

কাকাবাবু নীরসভাবে বললেন, আমরা কবে কোথায় যাই কোনও ঠিক তো নেই।

তা এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার এত আপত্তি কেন? আমি তো ঐদিকেই যাই!

তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না।

এতে তকলিফ কী আছে? আপনি এত বড় পড়ালিখা জানা আদমি, আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি-আপনি আজ কোনদিকে যাবেন?

আজও সোনমার্গই যাব!

সূচা সিং একটু অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আবার সোনমার্গ? ওখানে কিছু পেলেন? জায়গাটা তো একদম ন্যাড়া। কিছু নেই।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সিংখ্রজী, তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছি! আমি সোনা খুঁজছি না। সে সাধ্যও আমার নেই।

সূচা সিং গলার আওয়াজ নিচু করে বললেন, আপনি মার্টন-এর পুরনো মন্দিরে গেছেন? সবাই যে সূর্য দেবতার মন্দিরে যায় সেখানে নয়—পাহাড়ের ওপরে যে পুরনো মন্দির? লোকে বলে ঐ মন্দির ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরনো। সিকান্দর বুত শিকন ঐ মন্দির ভেঙে দেয়। কেন অতি কষ্ট করে ঐ বিরাট মন্দির ভেঙে দিল জানেন? ঐ মন্দিরের কোনও জায়গায় মণি মণ সোনা পোঁতা আছে। সিকন্দর বুত শিকন তা খুঁজে পায়নি। সেই সোনা এখনও আছে।

কাকাবাবু বললেন, তাহলে সে কথা আমাকে বলে দিচ্ছ কেন? সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে? নিজেই খুঁজে দেখো না।

সূচা সিং কাকাবাবুকে একটু তোষামোদ করার সুর করে বললেন, আপনারা পণ্ডিত লোক, আপনারা জানেন রাজারা কোথায় কোন জায়গায় গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন। সাধারণ লোকেরা কি ওসব জানতে পারে?

তাই যদি হত সিংজী, তাহলে পণ্ডিতরা এত গরিব হয় কেন? পণ্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না! আচ্ছা চলি?

সূচা সিং বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! কমসে কম এক পেয়ালা চা তো খান আমার সঙ্গে?

কাকাবাবু বললেন, আমি সকালে দুকাপের বেশি চা খাই না। সেই দু কোপ আজ খাওয়া হয়ে গেছে।

তা হলে খোকাবাবুকে কিছু খাইয়ে দিই! খোকাবাবু জিলাবি খেতে খুব ভালবাসে!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি কিছু খাব না। আমার পেট ভর্তি!

তবু সূচা সিং আজ আর কিছুতেই ছাড়লেন না। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে এড়ানো গেল না। আজ জোর করে আমাদের তুললেন নিজের গাড়িতে। একটা বেশ মজবুত জিপ গাড়ি, সূচা সিং সেই গাড়িতেই ওদিকেই কোথায় যেন যাচ্ছেন কোনও একজন সরকারী হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করতে।

যাওয়ার পথে সূচা সিং অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমি অবশ্য সব বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। কী সুন্দর ছবির মতন রাস্তা। পাহাড় চিরে এঁকেবেঁকে উঠেছে। দু পাশে পাইন আর পপলারের বন। মাঝে মাঝে চেনার গাছও দেখা যায়। চেনার গাছগুলো কী বড় বড় হয়, অনেকটা দেবদারু গাছের মতন-যদিও পাতাগুলো অন্যরকম। □ঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় আখরোট, খোবানি আর নাশপাতির গাছ। এগুলো অবশ্য আমার চোখে এখন নতুন লাগে না। আমি গাছ থেকে বুনো আপেল আর আঙুরও ছিড়ে ছিড়ে খেয়েছি। কলকাতায় বসে এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায়? কত যে গোলাপফুল রাস্তাঘাটে ফুটে আছে!

কাকাবাবুজিজ্ঞেস করলেন, সিংজী, তুমি এই কাশ্মীরে কতদিন আছ?

সূচা সিং বললেন যে, কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে, তখন তিনি এখানে এসেছিলেন লড়াই করতে। তখন সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর একটা আঙুল কাটা যায়।

সূচা সিং তাঁর বাঁ হাতটা দেখালেন, সত্যিই তাঁর কড়ে আঙুলটা নেই।

সূচা সিংহাসতে হাসতে বললেন, আমি সবাইকে কী বলি জানেন? এই কড়ে আঙুলের ধাক্কা দিয়েই আমি হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

তারপর, তুমি এখানেই থেকে গেলে?

না। যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীর আমার এমন পসন্দ হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখানেই চলে এলাম ব্যবসা করতে। এখন আমি এখানকারই লোক। কাশ্মীরি মেয়েকেই শাদী করেছি। দু। শো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম এখন দেখুন না, আমার নয়খানা গাড়ি খাটছে! কাশ্মীরের মাটিতে সোনা আছে, বুঝলেন! নইলে ইতিহাসে দেখুন না, সবারই লোভ ছিল কাশ্মীরের দিকে!

কাকাবাবু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তুমি লেগে থাকে। তুমি হয়তো একদিন এই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো সিংজী।

সোনমার্গ পৌঁছে সূচা সিং তাঁর চেনা একজন লোককে ডেকে বললেন, এই প্রোফেসার খুব বড়া আদমি। সব সময় এর দেখাশোনা করবে।

তারপর সূচা সিং চলে গেলেন। কাকাবাবু অবশ্য সূচা সিং-এর চেনা লোকটিকে পাত্তাই দিলেন না। তার হাত এড়িয়ে সোজা চলে এলেন। ঘোড়াওয়ালাদের জটলার দিকে। গত কালের সেই দুটো ছেলেকেই ঠিক করলেন আজ; কোনও রকম দরদরি না করেই ঘোড়ায় চড়ে বসে বললেন, চলো?

একটু দূরে গিয়েই কাকাবাবু থামলেন। ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এই তোমাদের নাম কী?

নাম জিজ্ঞেস করতেই ওদের কী লজ্জা। মেয়েদের মতন ওদের ফস গাল লাল হয়ে গেল। কিছুতেই বলতে চায় না। কেউ বুঝি কখনও ওদের নাম জিজ্ঞেস করেনি। একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। তাই দেখে আমি আর

কাকাবাবুও হাসতে লাগলাম। অনেক কষ্টে জানা গেল, একজনের নাম আবুতালেব। আর একজনের নাম তো বোঝাই যায় না। শুনে মনে হল, ওর নাম হুদা। কী? আর কিছু নেই? শুধু হুদা? তা সে জানে না। নামটা যেন খুবই একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

কাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, এরা হচ্ছে খশ জাতি। এদিককার পাহাড়ে এদের দেখা যায়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এখানে না এলে কি জানতে পারতাম, খশ জাতি নামেও একটা জাতি আছে আমাদের দেশে! যে-জাতের একটা ছেলে নিজের নামটাও ভাল করে জানে না। হুদার মতন একটা বিদঘুটে নাম কে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়েই ও খুব খুশি। অথচ কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। আর বেশ চটপটে, বুদ্ধিমান।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে? আমাদের থাকতে দেবে?

ছেলে দুটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ রকম প্রশ্ন ওরা কখনও শোনেনি। ওদের গ্রামে বোধহয় কোনও বাইরের লোক থাকেনি কখনও।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন, যদি থাকতে দাও। তাহলে রোজ দশ টাকা করে ভাড়া দেব। তাছাড়া খাবার খরচ আলাদা। যে-কোনও রকমের একটা ঘর হলেই আমাদের চলবে।

টাকাটা দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটল। পরস্পর কী যেন আলোচনা করে নিয়েই ওরা রাজি হয়ে গেল। তা বলে, ওদের কিন্তু লোভী মনে করা উচিত নয়। ওরা বড় গরিব তো, টাকার খুব দরকার ওদের।

গলাঙ্গীর নামে একটা জায়গা আছে, সেইদিকে ওদের গ্রাম। আমরা উঠতে লাগলাম পাহাড়ি পথে। পাশ দিয়ে রুপের পাতের মতন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু বললেন,

ওর নাম কঙ্গনা নদী। সন্তু ঐ যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে, ঐ রাস্তাটা চলে গেছে লন্দাকে। এমনিতে লোক যাকে বলে। লাদাক। এই রাস্তাটা খুব ভয়ংকর। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

আস্তে আস্তে ঘোড়া চলছে, আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। কী সুন্দর জায়গাটা! এখানে এলে মরার কথা মনেই হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। দূরে একটা পাহাড়ের মাথা সব পাহাড়কে ছাড়িয়ে জেগে রয়েছে। সেটা দেখতে ঠিক মন্দিরের মতন।

কাকাবাবু, মন্দিরের মতন ঐ পাহাড়টার নাম কী?

ঠিকই বলেছিস, মন্দিরের মতন! সাহেবরাও ঐ পাহাড়ের নাম দিয়েছে। ক্যাথিড্রাল পীক। সব পাহাড় ছড়িয়ে উঠেছে। ওর মাথা। দেখলেই মনে হয় না, এক সময় দেবতারা থাকত। এখানে? ঐ যে রাস্তাটার কথা বললাম, ওটাকে ওয়াঙ্গাথ নালাও বলে। ঐ রাস্তা শুধু লন্দাকে নয়, ওটা দিয়ে সমরখন্দ, পামীর, বোখারা, তাসখন্দ যাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে থেকেও মানুষ ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছে। ঐ রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাকাবাবু, এই রাস্তা দিয়েই কি আর্যরা ভারতে এসেছিল?

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক বলা যায় না। আর্যদের বোধহয় রাস্তা কিছু কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছিল। ইন্দ্র কাশ্মীরে পাহাড় ফাটিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের মুক্তি দিয়েছিলেন-এ রকম একটা কাহিনীও আছে।

যেতে যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়ল। বন্দুকধারী মিলিটারি এসে আমাদের আটকাল। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। দেখালেন। কাগজপত্র। যে কোনও জায়গায় ঘোরাফেরা করার অনুমতিপত্র কাকাবাবুর আছে। কাকাবাবুর কাছে একটা রিভলবার থাকে। সেটা আর তার লাইসেন্সও দেখালেন বার করে।

মিলিটারির লোকেরা আমাদের চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রায় জোর করে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। আমাদের দেখে ওরা হঠাৎ যেন খুব খুশি হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু বললেন, ওরা তো কথা বলার লোক পায় না। মাসের পর মাস এখানে এমনি পড়ে আছে, আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে। তাই কথা বলার লোক পেলে ওদের ভাল লাগে।

সেখানে দুধে সেদ্ধ করা চা আর হালুয়া খেলাম। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। আমাকে একজন মিলিটারি বলল, খোকাবাবু, হরিণের শিং নেবে? এই নাও!

বেশ একটা হরিণের শিং উপহার পেয়ে গেলাম। মিলিটারি দুজনেই পাঞ্জাবী শিখ। ভারী ভাল লোক। ঠিক আত্মীয়-স্বজনের মতন ব্যবহার করছিল। আমাদের সঙ্গে। আমরা একটা পাহাড়ি গ্রামে থাকব। শুনে ওরা তো অবাক। কত রকম অসুবিধের কথা বলল। কাকাবাবু সে সব হেসে উড়িয়ে দিলেন। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উঠতে লাগলাম পাহাড়ি রাস্তায়। কাকাবাবু বললেন, আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশি উঁচুতে এসেছি।

আবু তালেব আর হুদীদের গ্রাম পাশাপাশি। কোন গ্রামে থাকব, তাই নিয়ে ওরা দুজনে আমাদের টানাটানি করতে আরম্ভ করল। কেউ ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত সব দেখেশুনে কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবু তালেবদের গ্রামটাতেই থাকবেন। তবে, হুদা আমাদের জন্য রান্নাটান্নাও অন্যান্য ব্যাপার দেখাশুনোর কোজ নেবে-এ জন্য সে-ও রোজ দশ টাকা করে পাবে।

ওদের গ্রামে পৌঁছুনো-মাত্র গ্রামের সব লোক ভিড় করে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল। ওদের গ্রামের বাচ্চারা কিংবা মেয়েরা আমাদের মতন জামাকাপড়-পরা মানুষই কখনও দেখেনি।

আবু তালেব নিজস্ব ভাষায় ওদের কী সব বোঝাল। ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করল খানিকক্ষণ। তারপর আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল! একখানা ছোট কাঠের ঘর,

বোধহয় অন্য কেউ থাকত, আমাদের জন্য এইমাত্র খালি করা হয়েছে। কাকাবাবু একবার দেখেই ঘরটা পছন্দ করে ফেলেছেন।

গ্রামখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। পাহাড়ের নীচের দিকে খুব ঘন জঙ্গল। শুনলাম, এই গ্রামে একটাই শুধু অসুবিধে, খুব জলের কষ্ট। পাহাড়ের একেবারে নিচু থেকে জল আনতে হয়। হোক, এই শীতে বেশি জল তো লাগবে না। আমাদের!

আমাদের ঘরখানার পেছনেই খানিকটা সমতল জায়গা। তার পর খাদ নেমে গেছে। খাদের ওপারে। আর একটা পাহাড়, সেই পাহাড়টা ভর্তি জঙ্গল। জানলা দিয়ে তাকালে মনে হয়, ঠিক যেন বিরাট একটা পাহাড়ের ছবি আকাশের গায়ে ঝোলানো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঘরটা ভাল করে গুছিয়ে ফ্যাল। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানে থাকতে পারবি তো?

আমি ঘাড় কাৎ করে বললাম, হ্যাঁ। কতদিন থাকব এখানে?

দিন দশ-বারো। এর মধ্যে যদি কিছু না হয়, তাহলে এবারকার মতন ফিরে যেতে হবে। তোরও তো ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে আসবে।

আমার ইস্কুল খুলতে এখনও কুড়ি দিন বাকি।

ঠিক আছে। এবার ভাল করে কাজ শুরু করতে হবে।

আমার শুধু একবার মনে হল, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণিরা জানতেও পারবে না, আমরা কোথায় আছি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দু চোখে আগুন, এক অশ্বারোহী

এখানে আমাদের চার দিন কেটে গেল। সারাদিন কাকাবাবু আর আমি ঘুরে বেড়াই, ফিতে নিয়ে মাপামাপি হয়। জঙ্গলের ভেতরেও চলে যাই। কাজ অবশ্য কিছুই হচ্ছে না, তবে বেড়ানো তো হচ্ছে। কাশ্মীরে অনেকেই বেড়াতে যায়, কিন্তু কেউ তো গুজর আর খশ জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের গ্রামে থাকেনি।

এই জায়গার লোকেরা যে কী ভাল তা কী বলব! আমাদের সঙ্গে ওরা অসম্ভব ভাল ব্যবহার করে। ওরা অনেকেই আমাদের ভাষা বোঝে না, আমিও ওদের ভাষা বুঝি না, তবু কোনও অসুবিধে হয় না। হাত পা নেড়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একদিন আমার কোটের একটা বোতাম ছিড়ে গিয়েছিল, সেটা শেলাই করার জন্য আমি সূচ-সুতো চেয়েছিলাম। কিছুতেই আর সেটা ওরা বুঝতে পারে না। একবার নিয়ে এলো একটা গামলা, একবার নিয়ে এলো বঁটি। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল, তখন কোটটা ছোঁ। মেরে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। একটু বাদেই ওদের বাড়ি থেকে বোতাম শেলাই করে আনল।

সন্ধেবেলাই বাড়ি ফিরে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয়। শীত এখানে বড্ড বেশি। খুব হাওয়া, সেইজন্য। ঘরের মধ্যে আমরা আগুন জ্বেলে রাখি। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়। গরম গরম মোটা মোট চাপাটি আর মুরগী ঝোল। হুদা তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের একটি মেয়েও দিনের বেলা আমাদের রান্নাটান্না করে দেয়। কাশ্মীরের লোকেরা ভাল রান্না করে, তবে নুন দেয় বড় বেশি। বলে-বলেও কমানো যায় না। এরা সবাই এত বেশি নুন খায় যে আমাদের কম নুন খাওয়ার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না। এরা ঝাল্লেও বেশি খায়, তবে সেটা এতদিনে আমার অভ্যোস হয়ে গেছে।

সারাদিনটা আমার বেশ ভালই কাটে। সন্ধের সময়ও মন্দ লাগে না, তখন গ্রামের দু চারজন বুড়ো লোক আসে, আগুনের ধারে বসে গল্প হয়।

কিন্তু রাত্তিরটা আমার কাটতেই চায় না। ঘুম আসে না, খুব ভয় করে। চারদিক নিঝুম। মনে হয়, নিজের বাড়ি থেকে কোথায় কতদূরে পড়ে আছি। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাবা-মার কাছ থেকে কোনও চিঠি পাইনি। আমারও লেখা হয়নি। পহলগাম থেকে লিখতাম। কিন্তু এখানে ধারেকাছে পোস্টাফিস নেই। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে। একটু একটু, বেশি না।

আমার কুকুরটার কথাও মনে পড়ে। এতদিন পর ফিরে গেলে ও কি আমায় চিনতে পারবে? মোটে তো দু সপ্তাহ হল এসেছি, অথচ মনে হয় যেন কতদিন কলকাতাকে দেখিনি। এইটাই বেশ মজার-বেড়াতে আসতেও খুব ভাল লাগে, আবার কয়েকদিন পরই কলকাতার জন্য মন ছটফট করে। রাত্তির বেলা ঘুম আসবার আগে যতক্ষণ একলা জেগে থাকি, তখনই কষ্ট হয় বেশি।

রাত্তিরে রোজ একটা শব্দ শুনতে পাই, সেটাই সবচেয়ে বেশি জ্বালায়। কী রকম অদ্ভুত শব্দ-অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে যায় না। মনে হয় যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়বার ভান করছে। কিন্তু আমি ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু বুঝেছি, তারা তো ওরকম কক্ষনো করে না।

জানলা খুলেও দেখার উপায় নেই। মাঝরাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে নিঘাত নিউমোনিয়া। তাছাড়া একলা একলা জানলা খুলতে আমার ভয় করে। এদিকে ওর মধ্যে কাকাবাবু আবার ঘুমের ঘোরে কথা বলতে শুরু করেছেন। কার সঙ্গে যেন তর্ক করছেন কাকাবাবু। উঠে গিয়ে যে কাকাবাবুর গায়ে ধাক্কা দেব তা-ও ইচ্ছে করে না। বালিশে মুখ গুজে কান বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। আমার কান্না পাচ্ছিল।

প্রথম রাত্তিরে কাকাবাবুকে আমি ডাকিনি, দ্বিতীয় রাত্তিরে আর না ডেকে পারলাম না। কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী? কী হয়েছে?

আমি বিবর্ণ মুখে বললাম, একটা কী রকম বিচ্ছিরি শব্দ।

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। তারপর বললেন, কেউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এত ভয় পাচ্ছ কেন?

আপনি শুনুন। অনেকক্ষণ ধরে, ঠিক একই জায়গায় ঐ এক রকম শব্দ।

কাকাবাবু আর একটু শুনলেন। হালকাভাবে বললেন, ঘোড়ারই তো শব্দ, আর তো কিছু না! ঘুমিয়ে পড়ো–

আমাদের জানলার খুব কাছে।

কাকাবাবুর সাহস আছে খুব। উঠে গলায় কমফটার জড়ালেন। আর একটা কমফটার দিয়ে কান ঢাকলেন-ওভারকেটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করলেন। তারপর দেখলেন জানলা খুলে। টর্চ জেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। আবার জানলা বন্ধ করে এসে বললেন, ওটা কিছু নয়। নিশ্চিন্তে ঘুমো–

কাকাবাবু জানলা খুলে টর্চটা যখন জ্বেলেছিলেন, তক্ষুনি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলা বন্ধ করতেই আবার শুরু হল।

আমার গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বললাম, কাকাবাবু, আবার শব্দ হচ্ছে!

হোক না। শব্দ হলে ক্ষতি কী আছে? যা চোখে দেখা যায় না, তার থেকে ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু–

আরে, এরকম পাহাড়ি জায়গায় অনেক কিছু শোনা যায়। রাত্তিরে সব আওয়াজই বেশি মনে হয়-তাছাড়া পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে কতরকম শব্দ হয়, কত রকম প্রতিধ্বনি-এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই শোনা যায় না।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

কাকাবাবু আমার খাটের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুই চোখ বুজে শুয়ে থোক-আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি-তাতেই ঘুম এসে যাবে।

কিন্তু একথা শুনে আমার লজ্জা করল। আমি কি ছেলেমানুষ নাকি যে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে? তা ছাড়া কাকাবাবু আমার জন্য জেগে বসে থাকবেন! আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই। এবার আমি ঘুমোতে পারব।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, সেই ভাল। ভয়কে প্রশ্রয় দিতে নেই। এ তো শুধু একটা শব্দ, এতে ভয় পাবার কী আছে?

আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ? আমাদের জানলার খুব কাছে?

কাকাবাবু আবার রিভলভারটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কৌন হ্যায়?

কোনও সাড়া নেই। তবে শব্দটা এবার আর থামল না।

কাকাবাবু বললেন, এমনও হতে পারে—শব্দটা অনেক দূরে হচ্ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হচ্ছে খুব কাছে। এত শীতে বাইরে বেরুনো উচিত নয়, না হলে বাইরে বেরিয়ে দেখা যেত। আচ্ছা দেখা যাক, কাল কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না।

পরদিন সন্ধেবোলা গ্রামের বৃদ্ধরা এলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। বড় বড় মাগে চা ঢেলে খাওয়া হতে লাগিল। ঘরের এক কোণে আগুন জ্বলছে, মাঝে মাঝে আমি তার মধ্যে একটা দুটো কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছি। কাকাবাবু এ কথা-সে কথার পর দুজন বৃদ্ধকে ঐ শব্দটার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

একজন বৃদ্ধ শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বুঝেছি। বাবুসাহেব, কাল তা হলে হাকো এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, হাকো কে?

কোনও কোনওদিন মাঝরাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। তবে ও কারুর ক্ষতি করে না।

অত রাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যায়?

বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গেলেন। কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তাছাড়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় না তো কোথাও! এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তো ঘোড়া দাবড়ায়।

ও ঐ রকমই।

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, নিশ্চয়ই এবার একটা ভূতের গল্প শোনাবে। গ্রামের লোকেরা এইসব অনেক গল্প বানায়-তারপর শুনতে শুনতে ঠিক বিশ্বাস করে ফেলে।

কাকাবাবু বৃদ্ধদের আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, হাকোকে দেখতে কী রকম? কমবয়েসী ছোকরা, না, বয়স্ক লোক? দিনের বেলা তার দেখা পাওয়া যা না?

বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর ফস করে লম্বা লম্বা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া টানতে লাগলেন। যেন তাঁরা ও বিষয়ে আর কিছুই বলতে চান না।

কাকাবাবু তবু ছাড়বেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই যে আপনারা হাকো না কার কথা বললেন, রাত্তির বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়-তাকে দেখতে কী রকম?

একজন বৃদ্ধ বললেন, বাবু সাহেব, ও কথা থাক। হাকো আপনার ক্ষতি করবে না, শুধু শব্দই শুনবেন। আপনার ভয়ের কিছু নেই।

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, শুধু শব্দ কেন, তার চেহারা দেখলেও আমি ভয় পাব না। আমি তো তার কোনও ক্ষতি করি নি? দিনের বেলা কেউ দেখেছে?

না, দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেনি।

আপনি তাকে কখনও দেখেছেন? রাত্তিরে?

বৃদ্ধটি চমকে উঠে বললেন, বাবুসাহেব, তাকে কেউ দেখতে চায় না। হাকো-কে দেখলে কেউ বাঁচে না। হাকো-র চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়-তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে দিনের বেলা সে আসে না, ইচ্ছে করে কারুর কোনও ক্ষতি করে না-

কাকাবাবু বললেন, হুঁ! চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। তাকে দেখতে কি মানুষের মতন না জন্তুর মতন? কোনও গল্প-টল্প শোনেননি? চোখের দিকে না। তাকিয়ে পেছন দিক থেকে যদি কেউ দেখে?

বৃদ্ধ বললেন, আমার ঠাকুদরি মুখে শুনেছি, একবার একটি মেয়ে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল। হাকো তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দেয়। মেয়েদের সে খুব সম্মান করে। সেই মেয়েটি দেখেছিল, হাকো খুব সুন্দর দেখতে একজন যুবাপুরুষ, তিরিশের বেশি বয়েস নয়-খুব লম্বা, মাথায় পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার-

তা সে বেচারা রোজ রাত্তিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন?

এ তো শুধু আজকালের কথা নয়! কত শো বছর ধরে যে হাকো এ রকমভাবে যাচ্ছে, কেউ জানে না। হাকো ছিল একজন রাজার সৈন্য-লদাকের রাস্তা দিয়ে সে রাজার খৎ নিয়ে যাচ্ছিল। এক দুশমন তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে। সেই থেকে প্রায় রাত্তিরে-

কাকাবাবু চুরুট টানতে টানতে হাসিমুখে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে? এখানে কুয়ো কোথায়? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?

বৃদ্ধ বললেন, না, সে আমরা কখনও দেখিনি। শুনেছি। এসব ঠাকুন্দা-দিদিমার কাছে-

আর একজন বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি ঐ সব জঙ্গল-টঙ্গলের দিকে বড় বড় কুয়ো আছে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত চলে যায়-

কাকাবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে? অনেক বকশিস দেব।

প্রথম বৃদ্ধ বললেন, না, বাবুসাহেব, আমি কোনওদিন কুয়োটুয়োর কথা শুনিনি। এদিকে জলই পাওয়া যায় না, তা কুয়ো থাকবে কী করে? পাহাড়ের গর্ত টর্ত হয়তো আছে, তাই লোকে বলে-

আমি হাকো সম্পর্কে আরও গল্প শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু কাকাবাবুর আর কোনও উৎসাহ নেই। ওর সম্পর্কে। কাকাবাবু উত্তেজিত হয়ে বারবার সেই কুয়োর কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বৃদ্ধ দুজনকে জেরা করতে লাগলেন, সারা গ্রামের কেউ কোনওদিন জঙ্গলের মধ্যে সেই কুয়ো দেখেছে কি না! বৃদ্ধ দুজন আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। বকশিসের লোভ দেখিয়েও জানা গেল না কিছুই। মনে হলো, হাকো-র সম্পর্কে ওঁদের খুবই ভয় আছেহাকোর ধারেকগছে যাবার ইচ্ছেও নেই। ওঁদের।

সেদিন রাত্তিরবেলা কাকাবাবু টর্চ আর রিভলভার হাতে নিয়ে জানলার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন। কিন্তু কোনও শব্দই শোনা গেল না। কাকাবাবু হেসে বললেন, আজ আমাদের ভুতমশাই বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। রোজ কি আর সারারাত ঘোড়া চালানো যায়! তাছাড়া রিভলভার থাকলে ভূতও ভয় পায়।

পরের দিনও প্রথম রাত্তিরে কিছু শোনা যায়নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সেই রহস্যময় ঘোড়সওয়ারকে-যার দু চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, তার নাম হাকো-কী করে যে লোক তার নাম জানল! আমি হঠাৎ হাকোর সামনে পড়ে গেছি,-। হাকো আগুন-জ্বালা চোখে তাকিয়েছে। আমার দিকে। আমি দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে-। ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুনলাম বাইরে সেই শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুললাম। কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে দেখার অনেক চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখা গেল না। আওয়াজ অনবরত চলল। যতক্ষণ জেগে রইলাম, সেই খটু খটু খটু খটু শব্দ। হাকো যদি ভূত হয়, তাহলে ঘোড়াটাও কি ভুত! ঘোড়ারা মরলে কি ভূত হয়? আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগিল। মনে হল, আর একদিনও এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। হাকোর গল্প শোনবার পরই কাকাবাবুর এই জায়গাটা সম্পর্কে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে।

সকালবেলা উঠলে কিন্তু ঐ সব কথা আর তেমন মনে পড়ে না। কতরকম পাখির ডাক শোনা যায়। নরম রোদুরে ঝকমক করে জেগে ওঠে একটা সুন্দর দিন। আবু তালেব আর হুদা দুটো ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হয়। মুখে সরল হাসি। তখন সব কিছুই ভাল লাগে।

আজকাল আর আমি ঘোড়া চালাবার সময় ওদের কারুকে সঙ্গে নিই না। নিজেই খুব ভাল শিখে গেছি। এক এক সময় খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। খানিকটা নিচে নেমে গেলে বেশ ভাল রাস্ত-সেখানে আর কোনও রকম ভয় নেই।

কাকাবাবু বললেন, এদিকটা তো মোটামুটি দেখা হল। চলো, আজ বনের ভেতরটা ঘুরে আসি।

আমি উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। বনের মধ্যে বেড়াতে আমার খুব পছন্দ হয়। এদিককার বনগুলো বেশ পরিষ্কার। বাউ আর চেনার গাছ-ভেতরটা অন্ধকার হলেও রাস্ত করে নেওয়া যায় সহজেই।

সেদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতেই সেই সাঙঘাতিক কাণ্ডটা হল। তারপর থেকেই আমাদের সব কিছু বদলে গেল। জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরছিলাম। কাকাবাবু এখানেও ফিতে বার করে মাপতে শুরু করেছেন। এতদিনে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এক একজন লোকের যেমন এক এক রকম বাতিক থাকে-তেমনি এই ফিতে মাপার ব্যাপারটাও কাকাবাবুর বাতিক। নইলে, এই জঙ্গলে ফিতে দিয়ে জায়গা মাপার কোনও মানে হয়?

জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাৎসেঁতে। কাল রাত্তিরেও বরফ পড়েছিল, এখন বরফ বিশেষ নেই, কিন্তু গাছগুলো থেকে চুইয়ে পড়ছে জল। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়। ফিতেটা ধরে দৌড়চ্ছিলাম, হঠাৎ আমি একটা লতা-পাতার ঝোপের কাছে পা পিছলে পড়ে গেলাম। বেশি লাগেনি, কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না উঠতে। জায়গাটা কী রকম নরম নরম। দূর থেকে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, সন্তু, লেগেছে? আমি উত্তর দিলাম, না, না, লাগেনি। কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না কিছুতেই। পায়ের তলায় শক্ত কিছু নেই। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি। জায়গাটা আসলে ফাঁপা-ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল।

চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই লতা-পাতা ছিড়ে আমি পড়ে যেতে লাগলাম নীচে। কত নীচে কে জানে।

ভয়ের চোটে নিশ্চয়ই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নীচে গিয়ে পড়লাম টের পাইনি। চোখ খুলে প্রথমেই মনে হল, আমি কি মরে গেছি না বেঁচে আছি? আর কি কোনওদিন মাকে, বাবাকে দেখতে পাব? মরে যাবার পর কী রকম লাগে তাও তো জানি না। চারদিকে ঘুট্‌ফুটে অন্ধকার। একটা পচা পচা গন্ধ। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগিল। কিন্তু ওপর থেকে পড়ার সময় খুব বেশি লাগেনি-কারণ আমার পায়ের নীচেও বেশ ঝোপের মতন রয়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। তাহলে নিশ্চয়ই মরিনি! আমি একটা বড় গর্ত বা লুকনো কোনও কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। ভয়ের চেয়েও, বেঁচে যে গেছি—এই জন্য একটু আনন্দই

হল সেই মুহূর্তে। আরও গভীর গর্ত যদি হত, কিংবা তলায় যদি শুধু পাথর থাকত-তাহলে এতক্ষণে-। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু-

কাকাবাবু অনেকটা দূরে আছেন। হয়তো শুনতে পাবেন না। নীচ থেকে কি আমার গলার আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে? ওপর দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় অন্ধকার। লতা-পাতা ছিড়ে যাওয়ায় সামান্য যা একটু ফাঁক হয়েছে, তাতেই একটু একটু আলো।

তবে একটা খুব আশার কথা, ফিতের একটা দিক আমার হাতে তখনও ধরা আছে। অন্য দিকটা কাকাবাবুর হাতে। এইটা দেখে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

শক্ত করে ফিতেটা এক হাতে চেপে রেখে আমি আর এক হাতে চার পাশটায় কী আছে দেখার চেষ্টা করলাম। গর্তটা বেশ বড়। একটা কুয়োর মতন, কিন্তু জল নেই। এই কুয়োতেই কি হাকো-কে মেরে ফেলা হয়েছিল? এটা কি হাকো-র বাড়ি?

ভয়ে আমার সারা গা শিরশিরিয়ে উঠলো। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু! কাকাবাবু!

চেঁচাতে চেঁচাতেই মনে হল, কাকাবাবু এসেও কি আমাকে তুলতে পারবেন। এখান থেকে? খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা কী করবেন? কেন যে আবু তালেব আর হুদাকে আজ সঙ্গে আনিনি। কাকাবাবু এখান থেকে ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ওদের ডেকে আনতে আনতেই যদি আমি মরে যাই? মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পচা পচা গন্ধটা বেশি করে নাকে লাগছে। আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না! আমি মরে গেলে আমার মায়ের কী হবে? মা-ও যে তাহলে কাঁদতে-কাঁদতে মরে যাবে!

গলা ফাটিয়ে আরও কয়েকবার আমি কাকাবাবুর নাম ধরে চেচালাম। এখনও আসছেন না কেন? হয়তো এখানকার কোনও শব্দ ওপরে পৌঁছয় না।

একটু বাদে আমার হাতের ফিতেয় টান পড়ল। কাকাবাবুর গলা শুনতে পেলাম, সন্তু? সন্তু?

এই যে আমি, নীচে–

ওপরে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ শব্দ হতে লাগল, আমার গায়ে গাছ লতাপাতার টুকরো পড়ছে। কাকাবাবু ছুরি দিয়ে ওপরের জঙ্গল সাফ করছেন। খানিকটা পরিষ্কার হবার পর কাকাবাবু মুখ বাড়ালেন, ব্যাকুলভাবে বললেন, সন্তু তোমার লাগেনি তো? সন্তু, কথা শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, পাচ্ছি। না, আমার লাগেনি।

উঠে দাঁড়াতে পারবে?

হ্যাঁ। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।

তোমার আশেপাশে জায়গাটা কী রকম?

কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ভীষণ অন্ধকার এখানে।

আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও–

কাকাবাবু আবার ছুরি দিয়ে গাছপালা কেটে সাফ করতে লাগলেন। গর্তের মুখটা প্রায় সবই পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াও! তোমার কোটের সামনের দিকটা পেতে ধরো, আমি আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি।

কোট পাততে হল না, এখন আমি গর্তের ওপর দিকটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কাকাবাবুলাইটারটা ফেলে দিতেই আমি লুফে নিলাম।

লাইটারটা জ্বালিয়ে দেখো, ওখানে কী আছে!

কাকাবাবু এই লাইটারে চুরুট ধরান। বেশ অনেকটা শিখা হয়। জ্বেলে চারপাশটা দেখলাম। গর্তটা বহু পুরনো, দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড়। দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত। একদিকে একটা সুড়ঙ্গের মতন। তার ভেতরটা এত অন্ধকার যে তাকাতেই আমার গা ছমছম করল। বোঁটকা গন্ধটা সেদিক থেকেই আসছে মনে হল। 8SR

সে-কথা কাকাবাবুকে বলতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিক আছে। কোনও ভয় নেই। আমি একটা দড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে আর এক দিক নীচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি শক্ত করে ধরবে।

তখন আমার মনে পড়ল, আমাদের ব্যাগের মধ্যে তো নাইলনের দড়ি আছে। ভীষণ শক্ত, কিছুতেই ছেড়ে না। তাহলে আর ভয় নেই। দড়ি ধরেই আমি ওপরে উঠে যেতে পারব।

দড়িটা নীচে এসে পড়তেই আমি হাতের সঙ্গে পাক দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। তারপর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বললাম, কাকাবাবু, অতি উঠছি ওপরে–

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, উঠে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আসছি।

কাকাবাবুর তো খোঁড়া পা নিয়ে নীচে নামবার দরকার নেই। তাই আমি চেঁচিয়ে বললাম, না, না, তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই উঠতে পারব।

কাকাবাবু হুকুম দিলেন, তুমি চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি এক্ষুনি আসছি।

সেই দড়ি ধরে কাকাবাবু নেমে এলেন। মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ফিসফিস করে বললেন, সন্তু, এই গর্তের মুখটা চৌকো-এই সেই চৌকো। পাতকুয়ো! আমরা যা খুঁজছিলাম বোধহয় সেই জায়গা।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। এই গর্তটা আমরা খুঁজছিলাম-এতদিন ধরে? কিন্তু কী আছে। এখানে? এখানে কি গুপ্তধন আছে?

কাকাবাবু সুড়ঙ্গটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, এর ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্তু, তুমি ভিতরে ঢুকতে পারবে?

কাকাবাবু এমনভাবে কথা বলছেন যেন এই গর্তটা তাঁর বহুদিনের চেনা। আমরা যে বিপদে পড়েছি, কাকাবাবুর ব্যবহার দেখে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। বরং বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করার বদলে তিনি ঐ বিচ্ছিরি সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢকুতে চান!

আমি কাকাবাবুর গা ঘেঁষে ওভারকেটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি মরে গেলেও ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে পারব না। কাকাবাবু একলা ঢুকলেও ভয়, কাকাবাবুর যদি কোনও বিপদ-টিপদ হয়ে যায়! কাকাবাবু নীচে নামবার সময় ক্রাচ দুটো আনেননি। ওঁর এমনি দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উনি কিছু গ্রাহ্য করছেন না

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, আগে দেখে নি, সুড়ঙ্গটা কত বড়।

কাকাবাবু লাইটারটা জ্বালালেন। তাতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। শুধু জমাট অন্ধকার।

সন্তু, দ্যাখ তো, শুকনো গাছটাছ আছে কি না, যাতে আগুন জ্বালা যায়! শুকনো গাছও নেই। বরং সব কিছুই ভিজে স্যাঁতসেঁতে। পাথরের দেয়ালে হাত দিলেও হাতে জল লাগে।

কাকাবাবু অধীর হয়ে বললেন, কী মুস্কিল, আগুন জ্বালাবার কিছু নেই? টার্চটা আনলে হত-বুঝবোইবা কী করে, দিনের বেলা-

আমি বললাম, কাকাবাবু, এখন আমরা ওপরে উঠে পড়ি বরং। পরে লোকজন ডেকে এনে দেখলে হয় না?

কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, না! এসব লোকজন ডেকে এনে দেখার জিনিস নয়।

আমি বললাম, কাকাবাবু ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ!

কাকাবাবু নাকে বড় রকম নিঃশ্বাস টেনে বললেন, গন্ধ? কই, আমি পাচ্ছি। না তো! অবশ্য, আমার একটু সর্দি হয়েছে। গন্ধ থাক না, তাতে কী হয়েছে? কাকাবাবু কাি্ট করে পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করলেন। তারপর সেটাতেই লাইটার থেকে একটু পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। রুমালটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখা গেল। গুহাটা বেশি। বড় নয়। কাকাবাবু মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আমি দারুণ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু, দ্যাখো, দ্যাখো-

গুহার একেবারে শেষ দিকে দুটো চোখ আগুনের মতন জ্বলজ্বল করছে। আমার তক্ষুনি মনে হল, হাকো বসে আছে ওখানে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম, এটা হাকোর বাড়ি। ও বেরিয়ে এসেই আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, হাকো! নিশ্চয়ই হাকোঁ! ওরা বলেছিল কুয়োর মধ্যে...

কাকাবাবু বললেন, ধ্যাৎ! হাকো আবার কী? তোর মাথার মধ্যে বুঝি ঐ সব গল্প ঢুকেছে।

তা হলে কী? চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে–

আগুন কোথায়? আলো পড়ে চকচক করছে।

তবে কি বাঘ? এত ঠাণ্ডা জায়গায় বাঘ থাকে না। খুব সম্ভব পাহাড়ি সাপ। পাইথন-টাইথন হবে। ভয়ের কিছু নেই। পাইথন তেড়ে এসে কামড়ায় না!

রুমালটা ততক্ষণে সবটা পুড়ে এসেছে। বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটা থেকে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, ধোঁয়ার জন্য আবার কাশি পেয়ে গেল।

কাকাবাবু হুকুম করলেন, সন্তু, তোমার পকেট থেকে রুমাল বার করো। আমি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি ধরে থাকো ওটা। এক পাশে সরে গিয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দাও গুহাটার দিকে।

কাকাবাবু রিভলভারটা বার করে বললেন, বেচারাকে মারা উচিত নয়, ও চুপ করে বসে ছিল, আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। কিন্তু সাপকে তো বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।

যদি সাপ না হয়?

সাপ ছাড়া আর কোনও জন্তু এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না।

কাকাবাবু সেই চোখ দুটো লক্ষ্য করে পর পর দুবার গুলি করলেন। হঠাৎ গুহাটার মধ্যে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকারে টু শব্দটিও ছিল না। এখন গুহাটার ভেতরে কে যেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাপাদাপি করছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপটার বীভৎস মুখখানা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। অনেকটা থেতলে গেছে। কাকাবাবু আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

আস্তে আস্তে থেমে গেল সব ছটফটানি। আমি উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি পিছু হটতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। এত জোরে বুক টিপটপ করছে যে মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখলেন সাপটার তখনও প্রাণ আছে কিনা। সেটা আর নড়ল না। আমি বললাম, ককাবাবু, যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে? সাপ কিংবা অন্য জন্তুজানোয়ার সব একসঙ্গে দুটো করে থাকে না?

আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসত।

তারপরেই কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি বারণ করার সময় পেলাম না। তখন দিশেহারা হয়ে গিয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম পেছন পেছন।

এই রুমালটাও প্রায় পুড়ে এসেছে। হাতে ছেকা লাগার ভয়ে আমি সেটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে। সেই আলোতে দেখা গেল। গুহার মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কালের টুকরো পড়ে আছে। শুধু মুণ্ডু আর কয়েকখানা হাড়। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, একটা মস্ত বড় লম্বা বশ। আর একটা চৌকো তামার বাক্স।

কাকাবাবু সেই তামার বাক্সটা তুলে নিয়েই বললেন, সন্তু, শিগগির বাইরে চলে এসে। এই বদ্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে, এখানকার অক্সিজেন ফুরিয়ে আসেছ। এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে আসবে। চলে এসো শিগগির...।

ঝোলানো দড়ি ধরে দেয়ালের শিকড়-ব্যাকড়ে পা দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলাম। আগে আমি, তারপর কাকাবাবু। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে কত কষ্ট। করে যে উঠলেন, তা অন্য কেউ বুঝবে না। কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের কোনও চিহ্ন নেই। আমিও তখন বিপদ কিংবা কষ্টের কথা ভুলে গেছি। বাক্সটার মধ্যে কী আছে তা দেখার জন্য আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। কত অ্যাডভেঞ্চার বইতে পড়েছি, এইরকমভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবার কথা। আমরাও ঠিক সেই রকম-বাক্সটার মধ্যে মণিমুক্তো, জহরৎ যদি ভর্তি থাকে–

কাকাবাবু টানাটানি করে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। তালা বন্ধও নয়, কিন্তু কীভাবে যে আটকানো তা-ও বোঝা যায় না। আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এলাম। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোণ ভেঙে ফেলা হল। বাক্সটা অবশ্য বহুকালের পুরনো, জোরে আছাড় মারলেই ভেঙে যাবে। ভাঙা দিকটা ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা উঠে এল।

বাক্সটার ভেতরে তাকিয়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম। মণি, মানিক্য, জহরৎ কিছুই নেই। কেউ যেন আমাদের ঠকাবার জন্যই বাক্সটা ওখানে রেখে গেছে। বাক্সটার মধ্যে শুধু একটা বড় গোল পাথর, গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কেউ বোধহয় আমাদের আগে ঐ গুহাটায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্তো সব নিয়ে তারপর অন্যদের ঠকাবার জন্য পাথর ভরে রেখে গেছে।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলাম, কাকাবাবুর মুখে দারুণ আনন্দের চিহ্ন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি। কাকাবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন। আমি ভাবলাম চশমার কাচ মুছবেন। কিন্তু তা তো নয়? মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

মূর্তি রহস্য

চোখ মুছে কাকাবাবু বললেন, সন্তু, এতদিনের কষ্ট আজ সার্থক হল। কতদিন ধরে আমি এর স্বপ্ন দেখেছি। নিজেরও বিশ্বাস ছিল না, সত্যিই কোনওদিন সফল হব। তোর জন্যই এটা পাওয়া গেল, তোর নামও সবাই জানবে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কাকাবাবুর পাশে বসে পড়লাম। কাকাবাবু খুব সাবধানে পাথরটা তুললেন। এবার আমি লক্ষ করলাম, ওটা ঠিক সাধারণ পাথর নয়, অনেকটা মানুষের মুখের মতন। যদিও কান দুটো আর নাক ভাঙা। সেই ভাঙা টুকরোগুলোও বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে। বোধহয় অজগরটার লেজের ঝাপটায় বাক্সটা ওলট-পালট হয়েছে, সেই সময় ভেঙে গেছে। কিংবা আগেও ভাঙতে পারে। কাকাবাবুর রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করে ফেলার পর মুখচোখ ফুটে উঠল। গলার কাছ থেকে ভাঙা। গোটা মূর্তি থেকে শুধু মুণ্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে। বহুকালের পুরনো মূর্তি, এমন কিছু দেখতে সুন্দরও নয় যে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়। এটার জন্য কাকাবাবু এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন?

কাকাবাবু ছুরি দিয়ে মুণ্ডুটার গলার কাছে খোঁচাতে লাগলেন। ঝুরঝুর করে মাটি খসে পড়ছে। অথাৎ মুণ্ডুটা ফাঁপা, মাটি দিয়ে ভূরে রাখা হয়েছে। এখনও ভাবছি, তাহলে বোধহয় এই মুণ্ডুটার ভেতরে খুব দামি কোনও জিনিস লুকানো আছে। হীরে মুক্তো যদি না-ও থাকে, তবুও কোনও গুপ্তধনের নক্সা অন্তত পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই বেরুল না, শুধু মাটিই পড়তে লাগল। একেবারে সাফ হয়ে যাবার পর, ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে কাকাবাবু আর একবার খুশি হয়ে উঠলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, সব মিলে যাচ্ছে। ভেতরে কী সব লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস তো? আমি অবশ্য এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারব না-কিন্তু পণ্ডিতরা দেখলে-। আমি সোনার খনি কিংবা গন্ধকের

খনি আবিষ্কার করতে আসিনি, এটা খুঁজতেই এসেছিলাম। এটার কাছে সোনা, রুপো তুচ্ছ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাকাবাবু, এটা করে মুণ্ডু?

সম্রাট কণিষ্কর নাম শুনেছিস? পড়েছিস ইতিহাস?

হ্যাঁ, পড়েছি। সম্রাট কণিষ্ককে দেখতে কী রকম ছিল, কেউ জানে না। কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রায় তাঁর মুখের খুব ঝাপসা ছবি দেখা গেছে-কিন্তু তাঁর কোনও পাথরের মূর্তিরই মুখ নেই। এই সেই মুখ। তুই আর আমি প্রথম তার মুখ আবিষ্কার করলাম। শুধু মুখ নয়-তার জীবনের সব কথা। ইতিহাসের দিক থেকে এর যে কী বিরাট মূল্য, তুই এখন হয়তো বুঝবি না, বড় হয়ে বুঝবি। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যাবে।

কিন্তু এটা যে সত্যিই কণিষ্কর মাথা, তা কী করে বোঝা যাবে?

ঐ যে মাথার ভেতরে সব লেখা আছে।

ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিছুই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি বললাম, যদি কেউ যে-কোনও একটা মুণ্ডু বানিয়ে তার মধ্যে কিছু লিখে দ্যায়, তাহলেই কি সবাই বিশ্বাস করবে?

কাকাবাবু বললেন, লেখার ধরন দেখে, ভাষা দেখে, মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতরা তার বয়েস বলে দিতে পারে। ওসব বোঝা খুব শক্ত নয়।

কিন্তু মূর্তির মাথার মধ্যে কিছু লেখা থাকে-আগে তো কখনও শুনিনি। তা ছাড়া, কণিষ্কর মাথা এই গুহার মধ্যে এল কী করে?

শোন, তা হলে তোকে গোটা ব্যাপারটা বলি, একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পৃথিবীতে এরকম চমকপ্রদ ঐতিহাসিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। পিরামিডের লিপি কিংবা হিট্টাইট সভ্যতা আবিষ্কারের সময় যে-রকম হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম।

কাকাবাবু পাথরের মুণ্ডুটা সাবধানে রাখলেন সেই বাক্সের ভেতরে। আরাম করে একটা চুরুট ধরলেন। মুখে সার্থকতার হাসি। বললেন, তুই পাইথনটা দেখে খুব ভয় পেয়েছিলি, না?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করলাম। ভাবতে গেলেই এখনও বুক কাঁপে।

রিভলভার-বন্দুক থাকলে পাইথন দেখে ভয় পাবার বিশেষ কারণ নেই। বাঘ, হায়না হলেই বরং বিপদ বেশি। বেচারা ওখানে নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছিল, বসে বসে রাজার মুণ্ডু পাহারা দিচ্ছিল। মরণ ছিল আমার হাতে।

কাকাবাবু, তুমি কী করে জানলে যে মুণ্ডুটা এই রকম একটা গুহার মধ্যে থাকবে?

বছর চারেক আগে আমি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছিলাম, তোর মনে আছে তো?

হ্যাঁ, মনে আছে।

ফেরার পথে আমি হংকং-এ নেমেছিলাম। হংকং-এ আমি কিছু বইপত্তর আর পুরনো জিনিস কিনেছিলাম-সেখানে একটা দোকানে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বহু পুরনো বই পেয়ে যাই। বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চীনা ডাক্তারের লেখা। ডাক্তারটির সুনাম ছিল পাগলের চিকিৎসায়। ডাক্তারি বই হিসেবে বইটার এখন কোনও দাম নেই, কারণ যে-সব চিকিৎসার কথা তিনি লিখেছেন, তা শুনলে লোকে হাসবে। যেমন, এক জায়গায় লিখেছেন, যে-সব পাগল বেশি কথা বলে কিংবা চিৎকার করে তাদের পরপর কয়েকদিন পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে পাগলামি সেরে যায়! আর এক জায়গায়

লিখেছেন, পাগলরা উল্টোপাল্টা কথা বললেই তাদের কানের সামনে খুব জোরে জোরে ঢাক ঢোল পেটতে হবে। সেই আওয়াজের চোটে তাদের কথা শোনা যাবে না। বেশিদিন কথা না রলতে পারলেই তাদের পাগলামি আপনি আপনি সেরে যাবে।

চুরুট নিভে গিয়েছিল বলে কাকাবাবু সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। আমি এখনও অগাধ জলে। চীনে ডাক্তারের লেখা বইয়ের সঙ্গে সম্রাট কণিষ্কের মুণ্ডু উদ্ধারের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাকাবাবু চুরুট কয়েকবার টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, যাই হোক, ডাক্তারি বই হিসেবে দাম না থাকলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে, সেগুলো পড়তে বেশ মজা লাগে। তারই মধ্যে একটা গল্প দেখে আমার মনে প্রথম খটকা লেগেছিল। ঐ ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু-এক শো বছর আগে চীনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি তাঁর নথিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন-কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকত, আর সর্বক্ষণ চেচাত-সম্রাট কণিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইদারায় বসে আছে, আমাকে সেখানে যেতে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও! পাগলের কল্পনা কত উদ্ভট হতে পারে। সেই হিসেবেই ডাক্তার-লেখকটি এই গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন-চার পাঁচ পাতা জুড়ে আছে সেই বর্ণনা। ঘটনাটি সত্যি অদ্ভুত। সম্রাট কনিষ্ক মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে—তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর যদি কেউ বলে তাঁর এক বন্ধু কণিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে একটা চৌকো ইদারায় বন্দী হয়ে আছে—তাহলে তার কল্পনা শক্তি দেখে অবাক হবারই কথা। পাগলদের মধ্যে এ খুব উঁচু জাতের পাগল। চীনা ডাক্তার তাই ওর কথা সবিস্তারে লিখেছেন। ঘটনাটা যেভাবে ঐ বইতে আছে সেটা বললে তুই বুঝবি না। চীনে ভাষায় নামটাম অনেক বদলে গেছে, জায়গার নাম ওলোট পালোট হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ লেখাটার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমার কাছে যেভাবে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেটাই তোকে বলছি।

কণিষ্কর কথা তো ইতিহাসে একটু একটু পড়েছিস। কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন এই প্রথম কণিষ্ক। খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উনি রাজত্ব করেছিলেন। এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ছিল ওঁর অধীনে, আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রায় দক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কণিষ্কর শাসন। অন্যান্য রাজারা ওঁকে এমন ভয় পেত যে বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের সম্রাট কণিষ্ক নিজের রাজ্যে নজরবন্দী করে রাখতেন বলে শোনা যায়। শুধু যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল সে রাজ্যেতাই-ই নয়, সম্রাটের নিজেরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে তখনকার লোকে বিশ্বাস করতো। পণ্ডিত সিলভ্য লেভি কনিষ্ক সম্পর্কে এই রকম একটা উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। আল বেরুনি-ও প্রায় একই রকম একটা কাহিনী বলেছেন তাঁর তাহকিক-ই-হিন্দ বইতে। চীনে ডাক্তারের সেই পাগলের গল্পের সঙ্গেও এসবের মিল আছে। তাই আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম।

গল্পটা হচ্ছে এই। গান্ধারের সম্রাট কণিষ্ক ভারত আক্রমণ করে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে চলেছেন। প্রবল তাঁর প্রতাপ, প্রাচ্য দেশের প্রায় সব রাজাই তাঁর নামে ভয় পায়। এ দিকে তিনি রাজ্য জয় করে চলেছেন-আবার ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি বৌদ্ধদের একটা মহা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন-এমন কথাও শোনা যায়। প্রজাদের কাছ থেকে তিনি ভয় ও ভক্তি এক সঙ্গে আদায় করে নিতে জানতেন। যাই হোক, এই সময় একদিন কেউ একজন তাঁকে খুব সুন্দর দুটি কাপড় উপহার দেয়। কাপড় দুটো দেখে সম্রাট কণিষ্ক মুগ্ধ হলেন, একটা নিজের জন্য রেখে আর একটা পাঠিয়ে দিলেন রানীকে।

তারপর একদিন রানী সেই কাপড়খানা পরে সম্রাটের সামনে এসেছেন, সম্রাট তাকে দেখেই চমকে উঠলেন। রানীর ঠিক বুকের মাঝখানে কাপড়টার ওপরে গেরুয়া রঙে মানুষের হাত আঁকা।

রাজা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, রানী! এ কী রকম শাড়ি পরেছ। তুমি? ঐ হাতটা আকার মানে কী?

রানী বললেন, মহারাজ, এই কাপড়টা। আপনিই পাঠিয়েছেন, আপনাকে খুশি করার জন্যই আমি আজ এটা পরেছি। আগে থেকেই কাপড়টাতে এই রকম হাত আঁকা ছিল।

শুনেই সম্রাট খুব রেগে গেলেন। তবে কি কেউ সম্রাটকে পুরনো কাপড় উপহার দিয়ে গেছে? কারুর এতখানি স্পর্ধা হবে, এ তো ভাবাই যায় না! রাজকোষের রক্ষককে ডেকে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, এর মানে কী? কে এই হাতের ছাপ একেছে।

রাজকোষের রক্ষক বললেন, মহারাজ, এই ধরনের সব কাপড়ের ওপরেই এই রকম হাতের ছাপ আঁকা থাকে।

সম্রাট হুকুম দিলেন, এই কাপড় যে উপহার দিয়েছে, তাকে ডাকো!

ডাকা হল তাকে। সে বেচারী এসে ভয়ে ভয়ে বলল, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। একজন বিদেশি বণিকের কাছে এই কাপড় দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই উপহার এনেছিল সম্রাটের জন্য।

সম্রাট কণিষ্ক ব্যাপারটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যেমন করে পারো, ধরে আনো সেই বণিককে।

অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে গেল। দুদিনের মধ্যেই সেই বণিককে ধরে এনে হাজির করলে সম্রাটের সামনে। দেখা গেল, বণিকের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে, কিন্তু সবগুলিতেই ঐ রকম গেরুয়া রঙের হাতের ছাপ আকা রয়েছে।

সম্রাট বললেন, বণিক, যদি সত্যি কথা বলে, তোমার ভয় নেই। কোথা থেকে এমন সুন্দর কাপড় পেয়েছ? কেনই বা এতে মানুষের হাতের ছাপ আঁকা।

বণিক ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বলল, মহারাজ, এই কাপড় আমি এনেছি দক্ষিণ ভারত থেকে। সেখানে সাতবাহন নামে এক রাজা আছেন। প্রত্যেক বছর এই কাপড় তৈরি করার পর সেই রাজার কাছে আনা হয়। তিনি সমস্ত কাপড়ের ওপরে নিজের হাতের ছাপ একে

দেন। ছাপটা ঠিক এমনভাবে পড়ে যে কোনও পুরুষ এই কাপড় পরিধান করলে ছাপটা থাকবে-ঠিক তার পিঠে, আর কোনও মেয়ে পরিধান করলে থাকবে তার বুকে।

সম্রাটের ভুকুঞ্চিত হল, রাগে থমথমে হল মুখ। রাজসভার অমাত্যদের বললেন, কাপড়গুলো পরে দেখতে। বণিকের কথাই সত্যি, প্রত্যেকের পিঠেই হাতের ছাপ।

সম্রাট কণিষ্ক কোষ থেকে তলোয়ার খুলে মেঘ গর্জনের মতো গম্ভীর গলায় বললেন, ঐ হাত কাটা অবস্থায় আমি দেখতে চাই। এখুনি দূত চলে যাক দাক্ষিণাত্যে, গিয়ে সেই উদ্ধত রাজা সাতবাহনকে বলুক, সে তার দুটো হাত ও দুটো পা কেটে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার রাজ্য আক্রমণ করব না। যদি না দেয়, তাহলে শীঘ্রই আমি আসছি।

দূত ছুটে গেল সাতবাহনের রাজ্যে। তখন সম্রাট কণিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভয় করে না। এমন কোনও রাজা নেই। কণিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার কোনও আশা নেই সাতবাহনের। কিন্তু সাতবাহনের মন্ত্রীরা রাজাকে খুব ভালবাসতেন। রাজাকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা সবাই মিলে একটা বুদ্ধি বার করলেন! তাঁরা দূতকে বললেন, আমাদের রাজা সাতবাহন বড্ড ভাল মানুষ, তিনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না। তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাও জানা যায় না। আমরা মন্ত্রীরাই রাজ্য চালাই। সম্রাটকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমরা কি আমাদের সবার হাত পা কেটে পাঠাব?

সম্রাট কণিষ্ক দূতের মুখে সেই কথা শুনে বললেন, সৈন্য সাজাও। আমি নিজে ওদের শিক্ষা দিতে যাব। হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে কনিষ্কর বিরাট সৈন্যবাহিনী চলল দক্ষিণাত্যে।

সাতবাহন রাজার মন্ত্রীরা সেই খবর শুনে রাজাকে লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায় একটা গোপন গুহায়। তারপর সোনা দিয়ে অবিকল সাতবাহনের মতন একটা মূর্তি বানিয়ে তাতেই রাজার পোশাক পরিয়ে নিয়ে গেলেন বাহিনীর সামনে। কনিষ্ক সেই মূর্তিটাকে বন্দী করে ছলনা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বক্রহাস্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীদের

বললেন, তোমরা শুধু আমার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দেখেছ, আমার নিজস্ব ক্ষমতা এখনও দেখোনি। এইবার সেটা দেখো।

সম্রাট কণিষ্ক নিজের তলোয়ার দিয়ে সেই সোনার মূর্তির হাত ও পা দুটো কেটে ফেললেন। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অলৌকিক উপায়ে মাটির নীচে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতবাহন রাজার হাত ও পা দুটোও কেটে পড়ে গেল।

আল বেরুনি যে কাহিনী বলেছেন, সেটা একটু অন্যরকম। কিন্তু তাতে সম্রাট কণিষ্কর আরও বেশি অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে। সেখানে কণিষ্ককে বলা হয়েছে পেশোয়ারের রাজা কণিষ্ক আর সাতবাহনের জায়গায় আছে কনৌজের রাজা। এবং কাপড়ের ওপরে হাতের ছাপের বদলে পায়ের ছাপ। যাই হোক, এটাও যে কণিষ্ক সম্পর্কে উপাখ্যান তা ঠিক বোঝা যায়। এতেও দেখা যায়, কনৌজের রাজার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রেখে, বিশ্বাসঘাতকের ভান করে কণিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির মধ্যে। সেখানে জলের অভাবে সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগল, যুদ্ধে হেরে যাবার মতন অবস্থা। তখন মহাপরাক্রান্ত সম্রাট কণিষ্ক সেই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমার ধারণা, আমি শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এতবড় সাম্রাজ্য গড়েছি? এইবার আমার নিজের ক্ষমতা দেখো।

সম্রাট কণিষ্ক তখন প্রকাণ্ড এক বশ্য নিয়ে সাঙ্ঘাতিক জোরে সেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ঝরনার জলের ধারা বেরিয়ে এল। কণিষ্ক সেই মন্ত্রীকে বললেন, যাও, এবার তোমার রাজার কাছে যাও। গিয়ে দেখে এসো, সেই রাজা এখন কেমন আছে। মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, লুকিয়ে থাকা অবস্থাতেই কনৌজের রাজার হাত পা কেটে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কণিষ্ক যে আগেও অনেকরকম এরকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে। তখনকার দিনে লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কণিষ্ক শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধে জেতেন না। তাঁর মাথাটাই সব-আশ্চর্য তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা।

আবার চুরুট জ্বলিয়ে কাকাবাবু বললেন, এর পরের ঘটনা আমি পেয়েছি চীনে ডাক্তারের লেখা সেই পাগলের কাহিনী থেকে। অথাৎ কিছু কিছু ঘটনা পেয়েছি। সেই পাগলের গল্প থেকে-তার সঙ্গে অন্য উপাদান মিলিয়ে আমি ব্যাপারটা জুড়ে নিয়েছি। সাতবাহন রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বংশের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু রাজপরিবার ও মন্ত্রীপরিবারের কয়েকজন পুরুষ ঐ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে। তারা ঠিক করে, ছদ্মবেশ ধরে বা যে-কোনও উপায়েই হোক, তারা কণিষ্ককে গুপ্তহত্যা করবে-এজন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। এই জন্য একদল লোক ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে, এমন কী ভারতের বাইরেও তারা যায়। কণিষ্ক যখন যেখানে যাবেন, তারা তাঁকে সেখানেই খুন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কণিষ্কর মতন এতবড় একজন সম্রাটের রক্ষীবাহিনীকে অতিক্রম করে তাঁকে খুন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তারা শেষ পর্যন্ত কণিষ্ককে খুন করতে পারেনি। এদিকে অহংকারী সম্রাট কণিষ্ক তাঁর জীবিতকালেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর মস্তিষ্কের অলৌকিক শক্তির জন্যই তাঁর এত প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশে তাঁর মূর্তির মাথার ভেতরে তাঁর কীর্তিকাহিনী সব খোদাই করে রাখা হয়। সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষরা কণিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে তাঁর মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিয়ে যায়। কণিষ্কর যে দুটি মূর্তি পাওয়া গেছে, দুটিরই মাথা এই জন্য ভাঙা।

চীনে ডাক্তার সেই পাগলের কাহিনীতে ভেবেছিলেন বুঝি পাগলটা সত্যিকারের কণিষ্কর কাটামুণ্ডুর কথা বলত। কিন্তু কণিষ্ক যে সেভাবে মারা যায়নি, তা সেকালের সবারই জানা ছিল। পড়ে আমার মনে হল, আসলে পাথরের মূর্তির মাথার কথাই বলেছিল সে।

ব্যাপারটা হয়েছিল। এই রকম। সাতবাহন বংশের সেই পুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তক বাহিনী। মহাভারতে যেমন সংসপ্তকদের কথা আছে-অর্থাৎ যারা নিজের জীবন দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করতে চায়। সেই সপ্তক বাহিনীর দুজন লোক চলে যায় কান্দাহার পর্যন্ত। সেখান থেকে কণিষ্ক মূর্তির মাথাটা ভেঙে নেয়। তাদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুণ্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানীর পায়ের কাছে রাখবে। তিনি সেটাতে পদাঘাত করে

শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়োবেন। কিন্তু কাশ্মীরের কাছে এসে তারা আটকে যায়। এটাই ছিল তখন যাতায়াতের রাস্তা। ফেরার পথে যখন তারা কাশ্মীরে এসে পৌঁছয়, তখন এখানে দারুণ গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে, কাশ্মীরেও একজন রাজার নাম ছিল কণিষ্ক। সেই কণিষ্ক আর আমাদের কণিষ্ক যদি এক হয় তা হলে কণিষ্কর মৃত্যুর পর এখানে হানাহানি শুরু হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এখানে তখন বিদেশি দেখলেই বন্দী কিংবা হত্যা করা হচ্ছে। সপ্তক বাহিনীর লোক দুটি পড়ল। মহাবিপদে। তারা দক্ষিণ ভারতের মানুষ, তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যাবে। গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় তারা এখানে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

কতদিন তাদের সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল, তা বলা শক্ত। কাশ্মীরে তখন চরম অরাজকতা চলছিল, তার মধ্যে বিদেশি মানুষ হিসেবে তাদের বিপদ ছিল খুবই। কিন্তু দিনের পর দিন তো মানুষ আর গর্তের মধ্যে বসে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পালা করে বেরুত রাত্তিরবেলা। খাবারদাবার সংগ্রহ করত, খোঁজখবর আনত। আমার কী মনে হয় জানিস, এখানকার গ্রামে যে হাকো সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে-সেটা ঐ সপ্তক বাহিনীর একজন সম্পর্কে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। রাত্তিরবেলা এই শীতে এখানে কেউ ঘোড়া চালায় না। সেকালে কেউ হয়তো মধ্য রাত্রে একজন অশ্বারোহীকে দেখে ফেলেছিল, তার হাতে থাকত মশাল-আমনি এক অলৌকিক গল্প। প্রাকৃতিক কারণে এখানকার পাহাড়-টাহাড়ে কোথাও বোধহয় ঘোড়ার ক্ষুরের মতন শব্দ হয়—তার সঙ্গে ঐ কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছে। সপ্তক থেকে হাকো হওয়া অসম্ভব নয়। মুখে মুখে উচ্চারণ এ রকম অনেক বদলে যায়। এখানে যো-জায়গাটার নাম এখন বানীহাল, আগে নাকি সেটার নাম ছিল বনশালা।

সেই দুজনের মধ্যে একজন এক রাত্তিরবেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যুদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। একা সে লড়াই করেও নিজেকে ছাড়াতে পারেনি। দস্যুদল তাকে কালিকট বন্দরে নিয়ে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন ক্রীতদাস প্রথা

ছিল জানিস তো? সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায়। আসলে তার সঙ্গী সেই গুহার মধ্যে সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে আছে-সে কোথায় চলে গেল জানতেও পারল না-এই চিন্তাই তাকে পাগল করে দেয়। বিশেষত, সঙ্গী যদি ভাবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসেছে-এই চিন্তাই বেশি কষ্ট দিত তাকে। কারণ, তখনকার দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞার খুব দাম দিত □ সেইজন্যই সে সব সময় চিৎকার করে করে ঐ কথা বলে সাহায্য চাইত পথের মানুষের কাছে। এমন কী অন্য কেউ যদি তার কথা শুনে সাহায্য করতে যায়-এইজন্য জায়গাটা এবং গুহার বর্ণনাও সে চেঁচিয়ে বলত। কিন্তু সবটাই গাঁজাখুরি কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একটা গুহার মধ্যে একজন লোক সম্রাট কণিষ্কর কাটা মুণ্ডু নিয়ে বসে আছে, একথা কে বিশ্বাস করবে!

চীনে ডাক্তারের সেই লেখা আর ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান মিলিয়ে আমি এই ব্যাপারটা মনে মনে খাড়া করেছিলাম। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময়ও এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। কিন্তু আর কারুকে বলিনি। ইতিহাসে এ-রকম অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। কিন্তু প্রমাণিত না হলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমারও এক এক সময় মনে হত পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। আবার কোনও সময় মনে হত—যদি সত্যি হয়, তাহলে ইতিহাসের একটা মহামূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে? তাই আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

চুরুটটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, এই সামান্য পাথরের টুকরোটার কত দাম এখন বুঝতে পারছিস? এর ভেতরে খোদাই করা লিপির যখন পাঠোদ্ধার হবে-ইতিহাসের কত অজানা তথ্য যে জানা হয়ে যাবে তখন! সাধারণ মানুষের কাছে এর কোনও মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এর যা দাম, তা টাকা দিয়ে যাচাই করা যায় না। তবে, টাকার দামেও এর অনেক দাম আছে। বিদেশের অনেক মিউজিয়াম এটা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে। আমরা অবশ্য কারুর কাছে এটা বিক্রি করব না, কী বলিস? আমরা ভারতের জাতীয় মিউজিয়ামকে এটা দান করব। নানা দেশের মানুষ এটা দেখতে আসবে কলকাতায়। চল, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

আমি অভিভূতভাবে কাকাবাবুর গল্প শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমি চলে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতের সেই সব জাঁকজমকের দিনে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম সম্রাট কণিষ্ককে। পুরু দুটি ঠোঁট, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অহংকার, চীনেকে ধরনের চোয়াল। আর সপ্তক বাহিনীর সেই দুটি লোক। একজন মাটির তলার গুহায় পাথরের মূর্তিটি নিয়ে বসে আছে, আর একজন রাত্তিরবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, হাতে মশাল-। কাকাবাবুর কথায় ঘোর ভেঙে গেল।

খুব সাবধানে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, শোন সন্তু, এ সম্পর্কে এখন কারুকে একটা কথাও বলবি না। কারুক্কে না। আমরা আজই পহলগ্রামে ফিরে যাবার চেষ্টা করব। যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়, কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে যাব দিল্লি। সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জনাব। তার আগে এটা সাবধানে জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে। সন্তু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। সারা জীবনে কখনও আমি এত আনন্দ পাইনি। মানুষ হয়ে জন্মালে অন্তত একটা কিছু মূল্যবান কাজ করে যাওয়া উচিত। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

বিপদের পর বিপদ

গ্রামে ফিরে গিয়েই আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম সোনমার্গের দিকে। কাকাবাবু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজি নন। খাবারদাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আমরা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কাকাবাবু বললেন, যে, পথে কোনও নদীর ধারে বসে খেয়ে নিলেই হবে।

গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এল। আমরা এ রকম হঠাৎ চলে যাব শুনে তারা তো অবাক! কেনই বা ওদের গ্রামে থাকতে এসেছিলাম, কেনই বা চলে যাচ্ছি। এত তাড়াতাড়ি, তা ওরা কিছুই বুঝল না। ওরা আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা করছে কে জানে! ওরা কেউ বাংলা দেশের নাম শোনেনি, কলকাতা শহরের নাম শুনেছে মাত্র দুজন। ঐসব লোকেরা ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছিল আমাদের। একজন মুসলমান বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করতে কেঁদেই ফেললেন। আবু তালেব আর হুদা তো এলই সোনমার্গ পর্যন্ত।

সোনমার্গে এসে আমরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বাসের আর পাত্তা নেই। বিকেল হয়ে এসেছে। এর পর আর বেশিক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবেও না। এ পথে। কাকাবাবু চেষ্টা করলেন কোনও জিপ ভাড়া করার জন্য। তাও পাওয়া গেল না। একটু বাদে একটা স্টেশন ওয়াগন হুস করে থামাল আমাদের সামনে। সামনের সীট থেকে দাড়িওয়ালা একটা মুখ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী প্রোফেসারসাব, পহলগ্রাম ফিরবেন নাকি?

সূচা সিং। আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা যখনই কোনও জায়গায় যাবার চেষ্টা করি, ঠিক সূচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওঁকে দেখে কাকাবাবু এই প্রথম একটু খুশি হলেন। নিজেই অনুরোধ করে বললেন, কী সিংজী, আমাদের একটু পহলগ্রাম পৌঁছে দেবে নাকি? আমরা গাড়ি পাচ্ছি না।

সূচা সিং গাড়ি থেকে নেমে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আপনি আমার গাড়িতে চড়বেন এ তো আমার ভাগ্য! আসুন, আসুন! কী খাে কাবাবু, গাল দুটো খুব লাল হয়েছে দেখছি। খুব আপেল খেয়েছ বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, সিংজী, তোমার গাড়ির যা ভাড়া হয় তা আমি দেব। তোমার ব্যবসা, আমরা এমনি-এমনি চড়তে চাই না।

সূচা সিং একগাল হেসে বললেন, আপনার সঙ্গেও ব্যবসার সম্পর্ক? আপনি একটা মানী গুণী লোক। তাছাড়া, আজ আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছি, আজ তো আমি ব্যবসা করতে আসিনি। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি কাশ্মীরি মেয়ে বিয়ে করেছি? এইদিকেই বাড়ি

গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির পেছনে নানান রকমের ফলের ঝুড়িতে ভর্তি। সূচা সিং বোধহয় ওসব উপহার পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র পেছনেই রাখলাম, কিন্তু সেই তামার বাক্সটা কাকাবাবু একটা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়েছিলেন, সেটা কাকাবাবু খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখলেন।

গাড়ি ছাড়ার পর সূচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার এদিককার কাজ কর্ম হয়ে গেল? কিছু পেলেন?

কাকাবাবু উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, না, কিছু পাইনি। আমি এবার ফিরে যাব।

ফিরে যাবেন? এর মধ্যেই ফিরে যাবেন? আর কিছু দিন দেখুন!

নাঃ, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বুঝতে পারছি। তাছাড়া গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাবার সম্ভাবনা নেই।

ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন! আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, এখানকার মাটির নীচে সোনা আছে। মাটন-এর দিকে যদি খোঁজ করতে চান, বলুন, আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করব।

তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো সিংজী, আমাকে দিয়ে হবে না।

কোন প্রোফেয়ারসাব, আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? আপনাকে আমি লোকজন, গাড়ি-টাড়ি সব দেব-আপনি শুধু বাৎলাবেন!

আমি বুড়ো হয়ে গেছি। পায়েও জোর নেই। আমি একটু খাটাখাটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার দ্বারা কি ওসব হয়?

আপনার ঐ বাক্সটার মধ্যে কী আছে?

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বাক্সটার গায়ে ভাল করে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ও, কিছু না, দু একটা টুকিটাকি জিনিসপত্তর।

কী আছে, বলুন না! আমি কি নিয়ে নিচ্ছি নাকি? হাঃ হাঃ–

আমি সূচা সিংকে নিরস্ত করবার জন্য বলে ফেললাম, ওর মধ্যে একটা পাথর আছে। আর কিছু নেই!

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। কাকাবাবু আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। সূচা সিং ভুরু কুঁচকে বললেন, পাথর? একটা পাথর অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন? সোনাটোনার স্যাম্পেল নাকি? সোনা তো পাথরের সঙ্গেই মিশে থাকে!

কাকাবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, আরে ধ্যাৎ, সেসব কিছু না। তুমি খালি সোনার স্বপ্ন দেখছি। এটা একটা কালো রঙের পাথর, দেখে ভাল লাগল, তাই নিয়ে যাচ্ছি।

আলাদা বাক্সে কালো পাথর? এদিকে কালো পাথর পাওয়া যায় বলে তো কখনও শুনিনি। প্রোফেসার, আমাকে একটু দেখাবেন?

পরে দেখবে। এখন এটা খোলা যাবে না।

কেন, খোলা যাবে না কেন? সামান্য একটা বাক্স খোলা যাবে না? দিন, আমি খুলে দিচ্ছি?

এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সূচা সিং একটা হাত বাড়ালেন বাক্সটা নেবার জন্য।

কাকাবাবু বাক্সটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, না এখন না। বলছি তো, এখন খোলা যাবে না!

সূচা সিং তবু হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দিন না, একটু দেখি!

পাথর নিয়ে যাচ্ছেন, না লুকিয়ে লুকিয়ে সোনার স্যাম্পেল নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা একটু দেখব, না! ভয় নেই, ভাগ বসাব না। শুধু দেখে একটু চক্ষু সার্থক করব!

কাকাবাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, না, এ বাক্সে হাত দেবে না। বারণ করছি, শুনছ না কেন?

সূচা সিং কঠিন চোখে তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। স্থির ভাবে। তাকিয়েই রইলেন দু এক মিনিট। আমি বুঝতে পারলাম, ওঁর মনে আঘাত লেগেছে। কাকাবাবুর দিকে থেকে মুখ ফেরালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমার নাম সূচা সিং। আমাকে এ তল্লাটের অনেকে চেনে। আমাকে কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না।

কাকাবাবু তখনও রাগের সঙ্গে বললেন, আমি বারণ করলেও কেউ আমার জিনিসে হাত দেবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। তুমি আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে না!

সূচা সিং বাক্সটার দিকে একবার, কাকাবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। আমার ভয় হল, সূচা সিং যে-রকম রেগে গেছেন, যদি এখানেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন! এখনও যে অনেকটা রাস্তা বাকি!

সূচা সিং কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন? একটা সামান্য পাথরও আপনি আমায় দেখাতে চান না! ঠিক আছে, দেখাবেন না। আমি কি আর জোর করে দেখব? আমি আপনাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি। আপনার মতন মানী গুণী লোক তো বেশি দেখি না। সারাদিন ব্যবসার ধান্দায় থাকি, তবু আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে দুটো কথা বললে ভাল লাগে। আপনি আমার ওপর রাগ করছেন?

কাকাবাবু তখনও রেগে আছেন, স্পষ্ট বোঝা যায়। তবু একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, কেউ কোনও কিছু একবার না বললে, তারপর আর সে নিয়ে জোর করতে নেই। তাহলেই রাগের কোনও কারণ ঘটে না।

ঠিক আছে, আমার গোস্তাকি হয়েছে। আমাকে মাপ করে দিন। তা প্রোফেসারসাব, সোনমার্গ ছেড়ে দিলেন, এবার কি অন্য কোনও দিকে কাজ শুরু করবেন?

না, আর কাজ-টাজ করার মন নেই। এবার কলকাতায় ফিরব!

সে কী, এত খাটাখাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের টুকরো নিয়ে ঘর যাবেন?

ওটা একটা স্মৃতিচিহ্ন!

এরপর কিছুক্ষণ কেউ আর কোনও কথা বলল না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কাকাবাবুর রাগ এখনও কমেনি, কাকাবাবু এমনিতে শান্ত ধরনের মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে সহজে রাগ কমে না। ঐ বাক্সটা তিনি আর কারুকে ছুতে দিতেও চান না।

একটু বাদে সূচা সিং আবার বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার কোটের পকেট থেকে একটা রিভলভার উঁকি মারছে দেখলাম। সব সময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন নাকি?

কাকাবাবু গভীরভাবে বললেন, জন্তু-জানোয়ার কিংবা দুষ্ট লোকের তো অভাব নেই। তাই সাবধানে থাকতে হয়।

সূচা সিং হেসে হেসে বললেন, সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক!

পহলগ্রামে এসে পৌঁছুলাম সন্ধের পর। নটা বেজে গেছে। গাড়ি থেকে নামবার পর সূচা সিং কাকাবাবুর দেওয়া টাকা কিছুতেই নিলেন না। বরং কাকাবাবুর করমর্দন করে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমি আপনার দোস্ত। গোসা করবেন না। যাবার আগে দেখা করে যাবেন! খোকাবাবু, আবার দেখা হবে, কী বলে?

আমার মনে হল, সূচা সিং মানুষটা তেমন খারাপ নয়। কাকাবাবু ওর ওপর আমন রাগ না করলেই পারতেন।

পহলগ্রামে লীদার নদীর ওপারে আমাদের তাঁবুটা রাখাই ছিল। যে রকম রেখে গিয়েছিলাম, জিনিসপত্তর ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে পৌঁছবার পর কাকাবাবু কাঠের বাক্সটা খুব সাবধানে তাঁর ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটার কথা কারুকে বলবে না। আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না। আমি যখন তাঁবুতে থাকব না, তুমি তখন সব সময় এটার সামনে বসে থাকবে। আর তুমি না থাকলে আমি পাহারা দেব। বুঝলে?

আমি বললাম, কাকাবাবু, মুণ্ডুটা আমি তখন ভাল করে দেখিনি, আর একবার দেখব এখন?

কাকাবাবু উঠে গিয়ে আগে তাঁবুর সব পদটিদা ফেলে দিলেন। অন্য সব আলো নিভিয়ে শুধু একটা আলো জ্বেলে রেখে তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বার করলেন কাঠের বাক্সটা। কাঠের

বাক্সটার মধ্যে সেই পুরনো তামার বাক্স, সেটার গায়েও এক সময় কী যেন লেখা ছিল– এখন আর পড়া যায় না।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে কাকাবাবু কণিষ্কর মুখ মুছতে লাগলেন। এখন তার কপাল, চোখ, ঠোঁটের রেখা অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাঙা নাক ও কান দুটো জোড়া দিলে সম্পূর্ণ মুখের আদল ফুটে উঠবে। কাকাবাবুকী স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোচ্ছেন সেই পাথরের মূর্তিতে। আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, সন্তু, এটার আবিষ্কারক হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে?

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করে আমরা খুব সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। আজ রাত্তিরে আর কাকাবাবু ঘুমের ঘোরে কথা বলেননি একবারও। আজ তিনি সত্যিকারের শান্তিতে ঘুমিয়েছেন।

ভোরবেলা কাকাবাবুই আমাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যেই ওঁর দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। কাকাবাবু বললেন, লীদার নদীর জলে রোদ্দুর পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, দ্যাখো! কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে, না?

কাকাবাবু, আমরা কি আজই ফিরে যাব?

প্লেনে কবে জায়গা পাই সেটা দেখতে হবে। আজ জায়গা পেলে আজই যেতে রাজি। তুমি সব জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করে ঠিক করে রাখো।

বেলা বাড়ার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুমি তাঁবুতে থাকো, আমি সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। ব্যাসাম সাহেব আর ব্রতীন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে–ওঁরা কণিষ্ক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আমি না। আসা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যাবে না।

কাকাবাবু চলে গেলেন। আমি খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলাম। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। পড়তে পড়তে মনে হল, আমরা নিজেরাও কম অ্যাডভেঞ্চার

করিনি। গুহার মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, পাইথন সাপ—কলকাতায় আমার স্কুলের বন্ধুরা শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে। তখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে।

কাকাবাবুজিগ্যেস করছিলেন, কাশ্মীর ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করবে: কি না! সত্যি কথা বলতে কী, আমার আর একটুও ভাল লাগছিল না থাকতে। যদিও শ্রীনগর দেখা হল না, তাহলেও-। পৃথিবীর লোক কখন আমাদের আবিষ্কারের কথা জানবে, সেই উত্তেজনায় আমি ছটফট করছিলাম।

কতক্ষণ বই পড়েছিলাম জানি না। হোটেলের বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে এলো তখন খেয়াল হল। ওপারের হোটেল থেকে আমাদের তাঁবুতে খাবার নিয়ে আসে। কিন্তু কাকাবাবু তো এখনও এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কাকাবাবুর জন্য। তারপর খিদেয় যখন পেঁটি চুই চুই করতে লাগল, তখন খেয়ে নিলাম নিজের খাবারটা। কাকাবাবুর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখলাম।

বিকেল গড়িয়ে গেল তখনও কাকাবাবু এলেন না। দুশ্চিন্তা হতে লাগল খুব। কাশ্মীরে এসে কাকাবাবু কক্ষনো একলা বেরোননি। সব সময় আমি সঙ্গে থেকেছি। কিন্তু এখন যে একজনকে তাঁবুতে পাহারা দিতে হবে! এত দেরি করার তো কোনও মানে হয় না। ছোট জায়গা, পোস্ট আফিসে লাইন দিতেও হয় না। কলকাতার মতন। কাকাবাবুর কোনও অ্যাকসিডেনট হয়নি। তো? হঠাৎ জরুরী কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছে? কিন্তু তাহলে কি আমায় খবর দিয়ে যেতেন না? কাকাবাবু তাঁবু থেকে বেরুতে বারণ করেছেন, আমি খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না।

বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত নেমে এল। কাকাবাবুর দেখা নেই। এতক্ষণ এক-একা এই তাঁবুতে থেকে আমার কান্না পাচ্ছিল। কিছুই করার নেই, কারুর সঙ্গে কথা বলার নেই। কী যে খারাপ লাগে! আমার বয়সী কোনও ছেলে কি কখনও এতটা সময় একলা থাকে? সেই সকাল থেকে-এখন রাত সাড়ে নটা। মনে হচ্ছিল, তাঁবুর মধ্যে আমায় যেন

কেউ বন্দী করে রেখেছে! কাকাবাবুর কাছে কথা দিয়েছি যে মুণ্ডুটাকে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাব না-তাই বেরুনোর উপায় নেই। যদিও, আমাদের কাছে যে এই মহা মূল্যবান জিনিসটা আছে সে কথা কেউ জানে না।তবু কাকাবাবুর হুকম, সব সময় ওটা চোখে চোখে রাখা। এখন আমি কী করব কে আমায় বলে দেবে?

রাত নিঝুম হবার পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর আগে কোনওদিন আমি একলা কোথাও ঘুমোইনি। আমার ভয় করে। কিছুতেই ঘুম আসে না। খালি মনে হয়, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কাদের যেন পায়ের দুপদীপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলাম, আমার মাথার কাছে একটা বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হল চোখের ভুল। একবার চোখ বন্ধ করে আর একবার তাকাতেই দেখলাম তখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। প্রথমে মনে হল, ইতিহাসের আমল থেকে বোধ হয় কোনও আত্মা এসেছে প্রতিশোধ নিতে। তারপরই বুঝলাম, তা নয়, আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মস্ত বড় একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরল। আমি সে হাতটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে আরও দুজন লোক আছে। তাদের একজন আমার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় ভরে দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল। হাত আর পা দুটোও বাঁধল। তারপর তারা তাঁবুর সব জিনিসপত্তর লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। একটু বাদেই তারা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

ঘটনোটা ঘটতে দুতিন মিনিটের বেশি সময় লাগল না। আমার মুখ বন্ধ, হাত পা বাঁধা, কিন্তু দেখতে পেলাম। সবই। কারণ ওরা মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছিল। তাঁবুর সব জিনিস ওরা ওলোট পালোট করে গেল, কিন্তু ওরা একটা জিনিসই খুঁজতে এসেছিল।

এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল, কেউ কোনও জিনিস নেয়নি। আজ ডাকাতি হয়ে গেল। তবে, ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। অন্ধকারে মুখ দেখা না

গেলেও যে-হাতটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল, সেই হাতটার একটা আঙুল কাটা ছিল। সূচা সিং-এর একটা আঙুল নেই।

ওরা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। যতক্ষণ ওরা তাঁবুতে ছিল, ততক্ষণ খালি মনে হচ্ছিল ওরা যাবার সময় আমাকে মেরে ফেলবে।

বেশ খানিকটা পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। হাত বাঁধা, চ্যাঁচাবারও উপায় নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তো সারারাত কাটানো যায় না।

আস্তে আস্তে নোমলাম খাট থেকে। জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম। দুবার পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে, তবু এগুনো যায়। ইস্কুলের স্পোর্টসে স্যাক রেস-এ দৌড়েছিলাম আমি, অনেকটা সেই রকম, কিন্তু বুক এমন কাঁপছে যে ব্যালেন্স রাখতে পারছি না।

কোনও রকমে পৌছুলাম টেবিলের কাছে। ড্রয়ার খুলে বার করলাম ছুরিটা। কিন্তু ছুরিটা ঠিক মতন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতি কষ্টে ছুরিটা বেঁকিয়ে ঘষতে লাগলাম হাতের দড়ির বাঁধনে। প্রথমে মনে হল, এটা একটা অসম্ভব কাজ। এ ভাবে সারা রাত ঘষেও দড়ি কাটা যাবে না-কারণ আঙুলে জোর পাচ্ছি না। শীতে আমি বাঁশ পাতার মতন কাঁপিছি। কিন্তু বিপদের সময় মানুষের এমন মনের জোর এসে যায় যে অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক সময়। একবার ছুরিটা পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তুলতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে গেলাম—একটুর জন্য আমার গালটা কাটেনি। সেই অবস্থায়, মাটিতে শুয়ে শুয়েই আমার মনে হল, ঘাবড়ালে কোনও লাভ নেই, কান্নাকাটি করলেও কোনও ফল হবে না-আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে, কাটতেই হবে হাতের বাঁধন। ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় আধা ঘণ্টা লাগল কাটতে, ততক্ষণে আমার হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। এঃ, আমার মুখের মধ্যে এমন একটা ময়লা রুমাল ভরে দিয়েছিল যে দেখেই আমার বমি পেয়ে গেল, বমি করে ফেললাম মাটিতে।

এই সময় বমি করার কোনও মানে হয়? কিন্তু রুমালটায় এমন বিশ্রী গন্ধ যে কিছুতেই সামলানো গেল না। ফ্লাস্কের গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম। তাও, ঠিক ঠক করে কাঁপতে লাগিলাম শীতে।

তাঁবুর মধ্যে এক নজর তাকিয়েই বোঝা যায়, ওরা সেই কাঠের বাক্সটা নিয়ে গেছে। পাথরের মুণ্ডুটার কোনও মূল্যই ওদের কাছে নেই-তবু কেন নিয়ে গেল? হয়তো। ওরা নষ্ট করে ফেলবে। ওরা কি কাকাবাবুকে মেরে ফেলেছে! ওরা কি আমাকেও মারবে?

ডাকাতের বউ আর ছেলেমেয়ে

বিপদের রাত্রি অনেক দেরি করে শেষ হয়। সারা রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। চোখ ঢুলে আসছিল, তবু ঘুমোইনি। আস্তে আস্তে যখন সকাল হল, তখন মনের মধ্যে একটু জোর পেলাম। দিনের আলোয় অনেকটা সাহস আসে। মনে মনে ঠিক করলাম, ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে। কোনও লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু আমি একলা একলা কী করব? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? বাচ্চা ছেলে বলে হয়তো আমার কথা উড়িয়ে দেবে। কাকাবাবুর মতন একজন বয়স্ক জলজ্যান্ত লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সূচা সিং-এর হাত আছে তাতে। কাকাবাবু থাকতে থাকতে মূর্তিটা নিতে সাহস করেননি। কাকাবাবুর সঙ্গে রিভলভার থাকে। তাই কাকাবাবুকে আগে সরিয়ে তারপর জিনিসটা নিয়ে যাওয়া হল! সূচা সিং-এর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, ওঁর বিরুদ্ধে আমার কথা কে শুনবে?

আমাদের পাশের তাঁবুতে কয়েকজন জামান ছেলেমেয়ে থাকে। একটু একটু আলাপ হয়েছিল। ওদেরও বলে কোনও লাভ নেই, ওরা বিদেশি, কী আর সাহায্য করতে পারবে? চট করে মনে পড়ে গেল সিদ্ধার্থদার কথা। সিদ্ধার্থদা, সিন্ধাদি, রিণি-ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে? হয়তো এর মধ্যেই ফিরে শ্রীনগর চলে গেছে। এর মধ্যে কদিন কেটে গেল-অমরনাথ থেকে ফিরতে কদিন লাগে—সেটা আর কিছুতেই হিসেব করতে পারছি না। খালি মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অমরনাথ থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই প্লাজা হোটেলে উঠবে, সেখানে খবর পাওয়া যাবে।

কাকাবাবু বলেছিলেন, কোনওক্রমেই তাঁবু থেকে না বেরুতে। কিন্তু যে-জন্য বলেছিলেন, তার তো আর কোনও দরকার নেই। আসল জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে। আমাদের তাঁবুতে আর দামি জিনিস বিশেষ কিছু নেই। কাকাবাবু টাকা পয়সা কোথায় রাখতেন। আমি জানি

না—সেগুলোও বোধহয় ডাকাতরা নিয়ে গেছে। হোটেলের বিল কী করে শোধ হবে কে জানে! সিদ্ধার্থদাদের না পেলে চলবেই না।

হেঁটে হেঁটে গেলাম প্লাজা হোটেলে। সেখানে কোনও খবরই পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদারা হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন অমরনাথ—ফিরে এসেছেন কিনা। ওঁরা জানেন না। ফেরার পর রিজার্ভেশনও করা নেই। এর মধ্যে ফিরে এসে অন্য হোটেলেও উঠতে পারেন বা শ্রীনগরে চলে যেতে পারেন। আবার এখনও ফিরতে নাও পারেন, অথাৎ আমি কিছুই জানতে পারলাম না। তবে, পোপোটলাল নামে একজন পাণ্ডা গিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে-তার খোঁজ পেলে সব জানা যেতে পারে। পাণ্ডাজী যদি ফিরে থাকেন, তবে তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সব খবরাখবর। পোপোটলালের ঠিকানা? ঠিকানা কিছু নেই-বাজারের কাছে গিয়ে খোঁজ করলে লোকে বলে দেবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম প্লাজা হোটেল থেকে। কোথায় এখন পোপেটলালকে পাব? মানুষ হারিয়ে গেলে পুলিশকে খবর দিতে হয় শুনেছি। কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে।

পহলগ্রামের রাস্তা দিয়ে এখন কত মানুষজন হাঁটছে, কত আনন্দ সবার মুখে চোখে। আমার বিপদের কথা কেউ জানে না। আমাকে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করল না, খোকা, তোমার মুখটা এমন শুকনো দেখছি কেন? তোমার কি কিছু হয়েছে? আমারই বয়েসী কত ছেলে-মেয়ে হৈ চৈ করতে করতে যাচ্ছে বেড়াতে। আমার কেউ চেনা নেই। কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করব? বাবা আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততদিন আমি একা

হাঁটতে হাঁটতে বাস ডিপোর দিকে চলে এসেছিলাম। দু একটা দোকানে জিজ্ঞেস করেছি। পোপোটলালের খবর। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এখন খুব টুরিস্ট আসার সময়-দোকানদাররা খদের সামলাতেই ব্যস্ত—আমার কথা ভাল করে শোনার পর্যন্ত সময় নেই। হঠাৎ দেখলাম একটা বাসের জানলায় রিণির মুখ। এক্ষুনি বোধহয় বাসটা ছেড়ে দেবে। আমি প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম, হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে লাগলাম, রিণি, রিণি!

বাসটা ছাড়েনি। রিণি আর স্নিগ্ধাদি বসে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম, সিদ্ধার্থদা কোথায়?

স্নিগ্ধাদি বললেন, ও আসছে এক্ষুনি। তুই ওরকম করছিস কেন রে, সন্তু?

রিণি বলল, কাল সারাদিন তোকে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। ভাবলাম তোরা চলে গেছিস। আমরা পরশু ফিরেছি। অমরনাথ থেকে। এবার পহলগ্রামে আমরাও তাঁবুতে ছিলাম।

কাল সারাদিন আমি তাঁবুতে বসে ছিলাম, আর ওদিকে ওরা আমাকে খুঁজছে। লীদার নদীর ধারে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা তাঁবু– হয়তো আমাদেরটার কাছাকাছি ওরা ছিল, আমি টের পাইনি। এর কোনও মানে হয়?

একটু দম নিয়ে আমি বললাম, সিদ্ধার্থদাকে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুনি। স্নিগ্ধাদি, তোমাদের এই বাসে যাওয়া হবে না। নেমে পড়ো, শিগগির নেমে পড়ে।

স্নিগ্ধাদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে কী? আমাদের তো বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, মালপত্র তোলা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তোমরা আগে নেমে পড়ে, তারপর সব কথা বলছি।! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন। আমাদের তাঁবুতে-

রিণি হি-হি করে হেসে উঠে বলল, কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন? অতবড় একটা লোক আবার হারিয়ে যায় নাকি? বল তুই-ই হারিয়ে গেছিস, তোর কাকাবাবুই তোকে খুঁজছেন।

আঃ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না। রিণিটা একদম বাজে মাকর্ণ। দরকারী কথার সময়েও হাসে। ভাগ্যিস এই সময় সিদ্ধার্থদা এসে গেলেন।

আমি সিদ্ধার্থদাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, এ তো সত্যি সাঙঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সব মালপত্র উঠে গেছে, শ্রীনগরে লোক অপেক্ষা করবে। অথচ তোমাকে এক ফেলে যাওয়া যায় না। কী করা যায় বলে তো? এক্ষুনি ঠিক করতে হবে, দেরি করার সময় নেই! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

ততক্ষণে বাসটা স্টার্ট নিয়েছে, কণ্ডাক্টর হুইসল। বাজাচ্ছে ঘন ঘন। এ সব জায়গায় বাসে নিয়মকানুন খুব কড়া। সিদ্ধার্থদা জানলার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধাদিকে বললেন, শোনো, তোমরা দুজনে চলে যাও শ্রীনগরে। এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—আমি সন্তুর সঙ্গে থাকিছি-একদিন পর যাব।

স্নিগ্ধাদি তো কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, পাগল নাকি! আমরাও থাকব তাহলে। কণ্ডাক্টরকে বলো-

সিদ্ধার্থদা বললেন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো। শ্রীনগরে তো সব ঠিক করাই আছে, তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। তোমরা এখানে থাকলেই বরং অসুবিধা হবে। আমি একদিন পরেই আসছি।

বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, সিদ্ধার্থদা সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গেলেন বোঝাতে বোঝাতে। সিন্ধাদি আমাকে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কী হয়েছে বল তো সন্তু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এই সন্তু, তুই চুপ করে আছিস কেন?

কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ঐটুকু সময়ে-সিদ্ধার্থদা বললেন, যা হয়েছে পরে শুনতে পাবে। চিন্তা করো না, আমি কালকেই যাচ্ছি!

তারপর বাস জোরে ছুটিল, রিণি হাত নাড়তে লাগল।

সিদ্ধার্থদা যে প্রথম থেকেই আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন, বেশি কিছু জিজ্ঞেস না করেই থেকে যাওয়া ঠিক করলেন, সে জন্য সিদ্ধার্থদার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। সময় এত কম ছিল– ওর মধ্যে কি সব বুঝিয়ে বলা যায়?

বাসটা চলে যাবার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, চলো, কাজ শুরু করা যাক! তোমার কাকাবাবু কাল সকালবেলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি? তোমাকে কোনও খবর না দিয়ে তিনি কোথাও চলে যাবেন, তা হতেই পারে না!

আমি জোর দিয়ে বললাম, তা হতেই পারে না!

হুঁ! একটা জলজ্যন্ত লোক তা হলে যাবেই বা কোথায়?

সূচা সিং-

সূচা সিং? সে আবার কে?

সূচাসিং নামের একজন লোকের সঙ্গে কাকাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল। সেই লোকটাই তাঁবুর মধ্যে রাত্তিরবেলা আমাকে-

সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে সব শুনলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। আমার মনের ভেতরের ভয়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। সিদ্ধার্থদাকে যখন পিয়েছি, তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। যতক্ষণ একা ছিলাম, ততক্ষণ কী যে অসহ্য একটা অবস্থা- ।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, থানায় খবর দিয়েছ? দাওনি? চলো, আগে সেখানেই যাই।

থানায় দুজন অফিসার ছিলেন, তাঁদের নাম মীর্জা আলি আর গুরুবচ্চন সিং। খাতির করে বসতে বললেন আমাদের, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর মীজ আলি বললেন, বহুৎ তাজবীকী বাৎ! এখানে এরকম ঘটনা কখনও ঘটে না। দিনের বেলা একটা

লোক উধাও হয়ে যাবে কী করে? তাছাড়া সূচা সিং-এর নামে তো কেউ কোনওদিন কোনও অভিযোগ করেনি।

গুরুবচ্চন সিং বললেন, আপনাদের তাঁবু থেকে কী কী চুরি গেছে? দামী চিনিনা না না ছিল ?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কাকাবাবুর একটা রিভলভার ছিল, সেটা তিনি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কি না জানি না-সেটা পাচ্ছি না। আর কিছু টাকা পয়সা–

কত?

আমি তা জানি না।

ক্যামেরা-ট্যামেরা?

ছিল না। একটা দূরবীন ছিল, সেটা নেয়নি।

আশ্চর্য, এর জন্যই দিনেরবেলায় একটা লোককে...রাত্তিরবেলা তাঁবুতে ঢুকে...এখানে এ রকম কাণ্ড...ঠিক আছে, চলুন। এনকোয়ারি করে দেখা যাক–

পোস্ট অফিসে গিয়ে জানা গেল, কাকাবাবু সেখানে টেলিগ্রাম করতে যাননি। আগের দিন মাত্র তিনজন টেলিগ্রাম করতে এসেছিল, তার মধ্যে কাকাবাবুর মতন চেহারার কেউ ছিল না। দুজনই তাদের মধ্যে মহিলা, আর একজন স্থানীয় লোক। অথাৎ, যা হবার তা এখানে আসবার আগেই হয়েছে। আমাদের তাঁবুতে তদন্ত করে পুলিশ বুঝতে পারলেন, সেখানে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, কিন্তু অপরাধীর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। সাধারণ চোর ডাকাত যে নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। বাইনোকুলার, অ্যালার্ম ঘড়ি, পেন–এসব কিছুই নেয়নি। যে-ট্রাঙ্কটা চোররা ভেঙেছে, সেটার মধ্যেই একটা মানি ব্যাগ ছিল কাকাবাবুর, সেটাও চোরদের চোখে পড়েনি। সূচা সিং-এর গ্যারেজে গিয়ে শোনা গেল, সূচা সিং

বিশেষ কাজে মাটন গেছে, বিকেলেই ফিরবে। মীর্জা আলি হুকুম দিলেন সূচা সিং ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গুরুবচ্চন সিং বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল, খুব ভাল লোক-আমাদের সরকারের অনেকের সঙ্গে তাঁর চেনা জানা আছে, পহেলগ্রামে তাঁর কোনও বিপদ হবে, এতে পহ্নলগ্রামের বদনাম। সূচা সিং যদি দোষী হয়, তা হলে আমাদের হাত সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শাস্তি পাবেই। আপনারা বিকেলে আবার খবর নেবেন। আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুলিশদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সিদ্ধার্থদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তু, সকাল থেকে কিছু খেয়েছ? মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত চিন্তা করো না?

এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। সিদ্ধার্থদার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, কী দারুণ খিদে পেয়েছে! সেই মিষ্টির দোকানটায় ঢুকলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার সময় আমরা প্রত্যেকবার এখানে জিলিপি খেতাম। কাকাবাবু আজ নেই! কাকাবাবু কোথায় আছেন, কে জানে! আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল।

আমি সিদ্ধার্থদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কাকাবাবু বলেছিলেন, পাথরের মুণ্ডুটার কথা আমি যেন কোনও কারণেই কারুকে না বলি। সেইজন্য পুলিশকে বলিনি। কিন্তু সিদ্ধার্থদাকেও কি বলা যাবে না? সিদ্ধার্থদা তো আমাদের নিজেদের লোক। সিদ্ধার্থদার সাহায্য ছাড়া আমি একা কী করতে পারতাম? তাছাড়া সিদ্ধার্থদা ইতিহাসের অধ্যাপক, উনি ঠিক মূল্য বুঝবেন।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, সিদ্ধার্থদা, পুলিশকে সব কথা আমি বলিনি।

আমাদের একটা দারুণ দামি জিনিস চুরি গেছে–

কী?

আমরা সম্রাট কণিষ্ক-র মুণ্ডু আবিষ্কার করেছিলাম।

কী বললে? কার মুণ্ডু?

আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বললাম সিদ্ধার্থদাকে। সিদ্ধার্থদা অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সবটা। তারপর ছটফট করতে লাগলেন। বললেন, কী বলছ তুমি, সন্তু! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য যে কী দারুণ তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সেটা এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? অসম্ভব! যে-কোনও উপায়েই হোক, ওটা বাঁচাতেই হবে।

দোকানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা আবার বললেন, তুমি ঠিক জানো, রাত্তিরবেলা সূচা সিং-ই ঢুকেছিল? সেই ওটা নিয়ে গেছে?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আঙুল কাটা দেখেই আমি চিনেছি। তাছাড়া, ওটার কথা আর কেউ জানে না। সূচা সিংও জানত না-ও কাঠের বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়েছিল, ওর ধারণা ওর মধ্যে দামি কিছু জিনিস আছে।

সূচা সিং ঐ একটা পাথরের মুখ নিয়ে কী করবে? ইতিহাস না জানলে, ওটার তো কোনও দামই নেই। সূচা সিং ওর মূল্য কী বুঝবে? সে নিতে চাইবেই বা কেন?

সেটা আমিও জানি না। কিন্তু সিদ্ধার্থদা, ওর সব সময় ধারণা, কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজ করতে এসেছেন। ওর সেই সোনার জন্য লোভ।

কিন্তু যখন বাক্সটা নিয়ে দেখবে, ওতে দামি কিছু নেই, সোনা তো নেই-ই, তখন নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে। শুধু শুধু তো কেউ কোনও মানুষকে মারে না বা আটকে রাখে না।

কাকাবাবু বলছিলেন, বিদেশের মিউজিয়ামগুলো জানতে পারলে নাকি ওটার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দাম দিতে চাইবে।

তার আগে তো জানতে হবে, মুণ্ডুটা করে! সেটা সূচা সিং জানবে কী করে? সূচা সিংকে সে কথা জানাওনি তো?

না। সেইজন্যই বোধহয় কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে।

কাকাবাবু নিশ্চয়ই বলে দেবেন না?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থদা আপনমনেই বললেন, শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। ঐ পাথরের মুণ্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না। ওটাকে রক্ষা করতে না পারলে-সন্তু, তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবে? আমি একটু দেখে আসি–

না, সিদ্ধার্থদা, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। একলা থাকতে আমার ভয় করবে।

দিনের বেলা আবার ভয় কি?

না, আমি আপনার সঙ্গে যাব। আচ্ছা, সিদ্ধার্থদা, এমন হতে পারে না যে সূচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশকে ওর লোকেরা মিথ্যে কথা বলেছে?

তা মনে হয় না। পুলিশ তো যে-কোনও মুহূর্তেই সার্চ করতে পারে। তবু একবার গিয়ে দেখা যাক।

দু-একটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই সূচা সিং-এর বাড়িটা জানা গেল। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানে একজন মহিলা কাজ করছিলেন। কাশ্মীরি মেয়ে-কী সরল আর শান্ত তাঁর মুখখামা। দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা

করছে। মহিলা বোধহয় সূচা সিং-এর স্ত্রী। সূচা সিং-এর কাশ্মীরি বউ সেকথা শুনেছিলেন। বাড়িটা দেখলে মনে হয় না—এটা কোনও বদমাইস লোকের বাড়ি।

সিদ্ধার্থদা বাগানের গেটের সামনে গিয়ে খুব বিনীতভাবে বললেন, বাহিনজী, শুনিয়ে?

মহিলা একবার চোখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। কোনও উত্তর দিল না!

সিদ্ধার্থদা, আবার ডাকলেন, বাহিনজী একটা বাত শুনিয়ে!

মহিলাটি এবারও কোনও উত্তর দিলেন না, আমাদের দিকে তাকালেন না। বুঝতে পারলুম, বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ওঁকে। বাচ্চা ছেলে দুটি জুল-জুল করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

সিদ্ধার্থদা, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। এবার গলার আওয়াজ খুব করুণ করে বললেন, বাহিনজী, এক গিলাস পানি পিলায়েঙ্গে? বহৎ পিয়াস লাগা!

জল খেতে চাইলে কেউ কোনওদিন না বলতে পারে না। বিশেষত মেয়েরা। মহিলা এবার আমাদের দিকে তাকালেন। বাড়ির ভেতর গিয়ে এক গেলাস জল এনে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থদার দিকে।

সিদ্ধার্থদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, হামকো নেই, এই লেড়কাকো দিজিয়ে?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, নে খেয়ে নে! মাথা ঘোরা কমেছে!

আমি তো অবাক! তবু কোনও কথা বললাম না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই বাধ্য হয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিতে হল। সিদ্ধার্থদা সূচা সিং-এর বৌকে বললেন, এই ছেলেটার মাথা ঘুরছে। এর খুব শরীর খারাপ লাগছে হঠাৎ। কী করি বলুন তো? মাথায় জল ঢেলে দেব?

সূচা সিং-এর স্ত্রী-র দয়া হল। বাগানে একটা কাঠের বেঞ্চি ছিল,সেটা দেখিয়ে বললেন, ওর ওপর শুইয়ে দিন?

সিদ্ধার্থদা, আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, আজই শ্রীনগরে গিয়ে একে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। সূচা সিং যদি একটা গাড়ি দেন–

মহিলা বললেন, না, উনি বাড়ি নেই। গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারেজে গিয়ে দেখতে পারেন।

গ্যারেজে খালি গাড়ি নেই। একটা মাত্র আছে-কিন্তু সিংজীর হুকুম ছাড়া সেটা পাওয়া যাবে না।

কিন্তু উনি তো পহলগ্রামে নেই এখন!

সিদ্ধার্থদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমাদের খুব দরকার ছিল। সিংজী কবে ফিরবেন? আজ ফেরার কোনও চান্স নেই? খুব দূরে কোথাও গেছেন কি?

খুব দূর নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন সে কথা তো কছি বলেননি।

দেওগির গ্রামটা কোথায় যেন? মাটন-এর কাছেই না?

না, ওদিকে তো নয়। সোনমার্গের রাস্তায়। লীদার নদী ছড়িয়ে বাঁদিকে গেলেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। দেওগির তো খুব সুন্দর জায়গা! সিদ্ধার্থদা রীতিমত গল্প জমিয়ে নিলেন। ছেলেমেয়ে দুটো আমাদের কাছে এসে বড় বড় টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। আমাদের দিকে।

আমার মনে হল, মানুষের লোভ জিনিসটা কী বিচ্ছিরি! সূচা সিং-এর এই তো এত সুন্দর বাড়ি, আট-নখানা গাড়ি ব্যবসায় খাটাচ্ছে–তবু সোনার জন্য কী লোভ! সোনার লোভেই

কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে কোথাও। কাল রাত্তিরে আমাদের তাঁবুতে চুরি করতে গিয়েছিল। পুলিশ যখন ওকে ধরে ফাঁসি দেবে, তখন ছেলেমেয়েগুলো কাঁদবে কী রকম! শুনেছি। আগেকার দিনে কাশ্মীরে কেউ চুরি করলে তার নাক বা কান বা হাত কেটে দিত।

একটু বাদে আমরা সূচা সিং-এর স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। খানিকটা দূরে চলে আসার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, একবার দেওগির গিয়ে দেখবে নাকি? সূচা সিং-এর বউকে বেশ সরল মনে হল, বোধহয় মিথ্যে কথা বলেনি।

পুলিশের কাছে জানাবেন না?

হ্যাঁ, জানাব। ওরা যদি গা না করে আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসব একবার।

আবার আমরা থানায় গেলাম। পুলিশের লোকেরা সব শুনে বললেন, আপনারা এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন? আজি সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন।

মীর্জা আলি বললেন, সূচা সিংকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির করাব, কোনও চিন্তা নেই।

গুরুবচ্চন সিং বললেন, কী খোকাবাবু, আংকল-এর জন্য মন কেমন করছে?

থানা থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা বললেন, চলে আমরা নিজেরাই যাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

কিছুতেই আর গাড়ি পাওয়া যায় না। এখন পুরো সীজন-এর সময়, গাড়ির খুব টানাটানি। শেষ পর্যন্ত একটা গাড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে আসবে। সিদ্ধার্থদা এত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই! কী বলো, সন্তু?

দেওগির গ্রামের কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। রাস্তার দুপাশে ঘন গাছপালা। ফুল ফুটে আছে অজস্র। ময়না। আর বুলবুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে। কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা সরু ঝরনা, তার জলের কলকল শব্দ শোনা যায় একটানা।

দুজনে মিলে হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ। সূচা সিং-এর বাড়িটা কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না। কারুকে জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হতে লাগল, কাকাবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। এই রকম মনে হবার কোনও মানে নেই। তবু এক এক সময় মনে হয় না? সিদ্ধার্থদা, আর আমি দুজন রাস্তার দুদিক দেখতে দেখতে হাটছি। খানিকটা বাদে হঠাৎ আমি রাস্তার পাশে একটা জিনিস দেখে ছুটে গেলাম। কাকাবাবুর একটা ক্রাচ পড়ে আছে। আমার শরীরটা কী রকম দুর্বল হয়ে গেল, চোখ জ্বালা করে উঠল। কাকাবাবু তো ক্রাচ ছাড়া কোথাও যান না। এটা এখানে পড়ে কেন? তাহলে কি কাকাবাবুকে ওরা

সিদ্ধার্থদা, সেটা দেখে বললেন, এটা তো অন্য কারুরও হতে পারে। ক্রাচ তো এক রকমই হয়। সন্তু, তুমি ঠিক চিনতে পারছি?

হাঁ, সিদ্ধার্থদা। কোনও ভুল নেই। এই যে মাঝখানটায় খানিকটা ঘষাটানো দাগ? সিদ্ধার্থদা, কী হবে?

আরে, তুমি আগেই ভয় পাচ্ছ কেন? পুরুষ মানুষের অত দুর্বল হতে নেই। শেষ না-দেখা পর্যন্ত কোনও জিনিস মেনে নেবে না। একখানা ক্রাচ পড়ে আছে, আর একটা কোথায় গেল?

আর একটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদা সেটাকে তুলে হাতে রাখলেন। তারপর বললেন, আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে দিয়েছেন-চিহ্ন রাখবার জন্য। ওঁর খোঁজে যদি কেউ আসে, তাহলে এটা দেখে বুঝতে পারবে। পাশ দিয়ে এই যে সরু রাস্তাটা গেছে, চলে এইটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক।

সেই রাস্তাটা দিয়ে একটু দূরে যেতেই একটা বাড়ি চোখে পড়ল। দোতলা কাঠের বাড়ি। কোনও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে আমরা এগোলাম বাড়িটার দিকে। সিদ্ধার্থদা খুব সাবধানে তাকাচ্ছেন চারদিকে। হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে ধরে সিদ্ধার্থদা বললেন, ঐ দ্যাখো বলেছিলুম, ঐ যে আর একটা ক্রাচ।

একটা গোলাপের ঝোপের পাশে দ্বিতীয় ক্রাচটা পড়ে আছে। সিদ্ধার্থদা সেটাও তুলে নিলেন। আর কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।

সিদ্ধার্থদা মুখখানা কঠিন করে বললেন, আর্হ, একটা লোককে লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা! কেউ টের পাবে না।

আমি ফিসফিস করে বললাম, সিদ্ধার্থদা, এখন ফিরে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনলে হয় না?

এখন পুলিশ ডাকতে যাব? ততক্ষণে ওরা যদি পালায়? এসেছি। যখন, শেষ না দেখে যাব না।

কিন্তু ওরা যদি অনেক লোক থাকে?

তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি সন্তু?

না, না, ভয় পাইনি–

ক্রাচ দুটো দুজনের হাতে থাক। বেশ শক্ত আছে, দরকার হলে কাজে লাগবে।

কয়েকটা গাছের আড়ালে আমরা কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। পাশাপাশি তিনখানা ঘর, তার মধ্যে ডানদিকের কোণের ঘরটা তালাবন্ধ। আমি বললাম, হয়তো সবাই এখান থেকে আবার অন্য কোথাও চলে গেছে।

সিদ্ধার্থদা গম্ভীরভাবে বললেন, তা হতেও পারে। কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না।

সিদ্ধার্থদা, প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। এরপর আমরা ফিরবই বা কী করে?

সে ভাবনা পরে হবে। ফিরতে না পারি ফিরব না। কণিষ্কর মাথাটা আমি একবার অন্তত দেখবই।

একটু সন্ধে হতেই আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। এখনও কারুর দেখা নেই। পা টিপে টিপে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির পাশের ঘরটাই তালাবন্ধ, পাশের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না। মনে হল যেন একটা চৌপাই-তে একজন মানুষ শুয়ে আছে। চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যেতেই চিনতে পারলাম—কাকাবাবু!

সিদ্ধার্থদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ?

তারপর তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তালাটা পোল্লায় বড়। সিদ্ধার্থদা বললেন, তালাটা বড় হলেও বেশি মজবুত নয়। সস্তা কোম্পানীর তৈরি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওরা এরকম একটা বাজে। তালা লাগিয়ে রেখেছে। কেন! বাড়িতেও আর কেউ নেই মনে হচ্ছে।

সিদ্ধার্থদা ক্রাচের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দিলেন তালাটার মধ্যে। তারপর খুব জোরে একটা হ্যাঁচকাটান দিতেই তালাটা খুলে এলো।

সিদ্ধার্থদা বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে, আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে? আমি কিন্তু জীবনে এই প্রথম তালা ভাঙলাম।

ততক্ষণে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলেছি। ফিসফিস করে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু!

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। সিদ্ধার্থদাও পড়লেন এসে আমার পাশে। দাড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থদা প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে টেনে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। দরজাটা ওপাশ থেকে কেউ টেনে ধরে আছে। একটু ফাঁকও হল না। ধাক্কাধাক্কি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থদা।

কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, কে?

ঘরের মধ্যে আলো বেশি নেই, কিন্তু মানুষ চেনা যায়। কাকাবাবু আমাদের চিনতে পারছেন না! কাকাবাবুকে কি ওরা অন্ধ করে দিয়েছে! পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কাকাবাবুর চোখে চশমা নেই। চশমা ছাড়া উনি অন্ধেরই মতন।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি সন্তু। আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থদা–।

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, তোমরা আবার এরকম বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন?

আমি দেখলাম কাকাবাবুর ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে মেরেছে ওরা?

কাকাবাবু বললেন, ও কিছু না। তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে। এরা বিপজ্জনক লোক।

সিদ্ধার্থদা বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ আমাদের পেছন পেছনই আসছে।

জানলার বাইরে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। জানলায় দেখলাম সূচা সিং-এর বিরাট মুখ। সূচা সিং প্রথমেই বললেন-। না, বললেন না, বলল। ওকে আমি মোটেই আর আপনি বলব না। একটা ডাকাত, গুণ্ডা! আমার কাকাবাবুকে মেরেছে!

সূচা সিং বলল, কী খোকাবাবু, তোমার বেশি লাগেনি তো? একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়েছি।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমার কিন্তু খুব জোরে লেগেছে। আমাকে কী দিয়ে মারলে? লাঠি দিয়ে? অতবড় চেহারাটা নিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোথায়?

সূচা সিং বলল, এই ছোকরাটি কে খোকাবাবু? একে তো আগে দেখিনি।

আমি কিছু বলার আগেই সিদ্ধার্থদা বলে উঠলেন, আরও অনেককে দেখবে। পুলিশ আসছে একটু পরেই।

সূচা সিং আবার হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, আসুক, আসুক! অনেক জায়গা আছে। এ বাড়িতে খানাপিনা করুন, আরামসে থাকুন, কই বাত নেই! রাত্তিরে শীত লাগলে কম্বল নিয়ে নেবেন—ঐ খাটের নীচে অনেক কম্বল আছে।

কাকাবাবু খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায় পায় হেঁটে গেলেন জানলার দিকে। গম্ভীরভাবে বললেন, সূচা সিং, আমার চশমাটা দাও! চশমা নিয়ে তোমাদের কী লাভ?

সূচা সিং খানিকটা অবাক হবার ভাব দেখিয়ে বলল, চশমা? আপনার চশমা কোথায় তা আমি কী করে জানব! হয়তো আসবার সময় কোথাও পড়েটড়ে গিয়ে থাকবে।

না, তোমার লোক জোর করে আমার চশমা খুলে নিয়েছে।

তাই নাকি! খুব অন্যায়!

চশমাটা এনে দিতে বলো।

সে তো এখন এখানে নেই! এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনাকে তো এখন পড়ালিখা করতে হচ্ছে না!

কাকাবাবু হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমার মনে হল, যেন কণিষ্কর মুণ্ডু কিংবা আর সবকিছুর থেকে চশমাটাই এখন ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা!

সিদ্ধার্থদা বললেন, পুলিশকে আমি এই জায়গাটার নাম বলে এসেছি। আজ হোক কাল হোক পুলিশ এখানে ঠিক এসে পড়বে।

সূচা সিং বলল, আসুক না! পুলিশকে আমি পরোয়া করি না?

কাকাবাবু বললেন, সূচা সিং, তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছ। আমাদের ছেড়ে দাও।

প্রোফেসারসাব, আপনাকে ছেড়ে দিতে কি আমার আপত্তি আছে? আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি আমার কথাটা শুনুন।

তোমার ধারণা ভুল। আমি সোনার খবর জানি না।

ঠিক আছে। এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে, বাতচিত করুন। দেখুন, যদি আপনার মত পাল্টায়–

সূচা সিং, পাথরের মুণ্ডুটা আমার কাছে দিয়ে যাও। ওটা যেন কোনওরকমে নষ্ট না হয়। ওটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না।

ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে।

তোমাকে আমি ছাড়বো না

সূচা সিং জানলা থেকে সরে যাবার পর কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটা পাগল হয়ে গেছে! একটা পাগলের জন্য আমার এত পরিশ্রম হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা কাছে এসে কাকাবাবুর পাশে খাটের ওপর বসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ককাবাবু, তোমাকে কী করে নিয়ে এল এখানে?

কাকাবাবু অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন, আমাকে ধরে আনা খুবই সহজ। আমি তো দৌড়তেও পারি না, মারামারিও করতে পারি না। পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম, একটা গাড়ি আসছিল আমার গা ঘেঁষে। দুটো লোক তার থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। ঐখানে রাস্তাটা নির্জন, সকালে বিশেষ লোকও থাকে না-কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। আমিও চ্যাঁচামেচি করিনি, তাতে কোনও লাভও হত না-কারণ একজন আমার পাঁজরার কাছে একটা ছুরি চেপে ধরেছিল?

গাড়িতে করে সোজা এখানে নিয়ে এল?

না। কাল সারাদিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারেজের পেছনে একটা ঘরে। সূচা সিং-এর বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমি কোনও গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেই যে কাঠের বাক্সটা ওকে দেখতে দিইনি, তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে। এমনিতে ও আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি, শুধু বারবার এক কথা-ওকে আমি গুপ্তধনের সন্ধান বলে দিলে ও আমাকে আধা বাখরা দেবে।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার হাতে লাগল কী করে?

একবার শুধু ওর একজন সঙ্গী আমার হাতে গরম লোহার ছাঁকা দিয়ে দিয়েছে। সূচা সিং বলেছিল কাছে এনে ভয় দেখাতে, লোকটা সত্যি সত্যি ছাঁকা লাগিয়ে দিল। সূচা সিং

তখন বকল লোকটাকে। সূচা সিং আমার ওপর ঠিক অত্যাচার করতে চায় না। ওর কায়দা হচ্ছে, ভাল ব্যবহার করে আমাকে বশে আনা, ভোরবেলা আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে।

কিন্তু আপনাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড করেও তো ও কিছুই খুঁজে পায়নি। পাথরের মূর্তিটা দেখে ও তো কিছুই বুঝবে না। তাহলে এখনও আটকে রেখেছে কেন?

বললাম না, ও পাগলের মতন ব্যবহার করছে। মুণ্ডুটার ভেতর দিকে কতকগুলো অক্ষর লেখা আছে। ওর ধারণা ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান। সিনেমা-টিনেমায় যে রকম দেখা যায় অনেক সময়! বিশেষত, মূর্তিটার জন্য আমার এত ব্যাকুলতাই ওর প্রধান সন্দেহের কারণ। আমার সামনে ও মুণ্ডুটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে গিয়েছিল, আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম!

সিদ্ধার্থদা বললেন, ও যদি মুণ্ডুটার কোনও ক্ষতি করে, আমি ওকে খুন করে ফেলব!

কাকাবাবু বললেন, ওকে দমন করার কোনও সাধ্য আমাদের নেই। ওর সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে।

সিদ্ধার্থদা জানালার কাছে গিয়ে শিকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, জানালাটা ভাঙা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি।

কাকাবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, ঐ মুণ্ডুটা ফেলে আমি কিছুতেই যাব না। তার বদলে আমি মরতেও রাজি আছি। তোমরা বরং যাও-

কাকাবাবুকে ফেলে যে আমরা কেউ যাব না, তা তো বোঝাই যায়। সিদ্ধার্থদা ওভারকেট খুলে ভাল করে বসলেন। স্নিগ্ধাদি আর রিণি এতক্ষণে শ্রীনগরে পৌঁছে নিশ্চয়ই খুব

দুশ্চিন্তা করছে। আমরা কবে এখান থেকে ছাড়া পাব, ঠিক নেই। কিংবা কোনওদিন ছাড়া পাব কি না

একটু রাত হলে সূচা সিং দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজনের হাতে একটা মস্ত বড় ছুরি, অন্যজনের হাতে খাবারদাবার। সূচা সিং বলল, কী প্রোফেসারসাব, মত বদলাল?

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, সিংখ্রজী, তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি কোনও গুপ্তধনের খবর জানি না?

সূচা সিং ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, আপনারা বাঙালিরা বড় ধড়িবাজ! এত টাকা পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে আপনি শুধু ঐ মুণ্ডুটা খুঁজতে এসেছিলেন? এই কথা আমি বিশ্বাস করব?

ওটার জন্য আসিনি। এমনি হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

ঠিক আছে, ওটা কোথায় পেয়েছেন, সে কথা আমাকে বলুন। ওটা কীসের মুণ্ডু? কোনও দেওতার মুণ্ডু? আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোনও মন্দির নেই, আমি খোঁজ নিয়েছি। ওখানে পাথরের মুণ্ডু এল কোথা থেকে? বাকি মুর্তিটা কোথায়? বলুন সে কথা?

ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না ভেবে কাকাবাবু চুপ করলেন। সিদ্ধার্থদা তেজের সঙ্গে বললেন, আমরা ওটা যেখানে পাই না কেন? তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে? দেশে আইন নেই? পুলিশের হাত থেকে তুমি বাঁচাতে পারবে?

সূচা সিং-এর সঙ্গী ছুরিটা উঁচু করল। সূচা সিং তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বলল, আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না। চুপচাপ থাকো। তোমার মতন ছোকরাকে আমি এক রদ দিয়ে কাৎ করে দিতে পারি। যদি ভাল চাও তো মুখ বুজে থাকো! আমি শুধু প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলছি।

কাকাবাবু বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই!

খাবার রেখে ওরা চলে গেল। আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। সিদ্ধার্থদা ঢাকনাগুলো খুলে চমকে গিয়ে বললেন, আরে, বাস! খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে! বন্দী করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনও শুনিনি।

বড় বড় বাটিতে করে বিরিয়ানি, ডিম ভাজা, মুরগীর মাংস, চিড়ের পায়েস রাখা আছে। কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমাদের ভাল ভাল খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ও কাকাবাবুকে দলে টানতে চাইছে। সেইসব খাবার দেখেই আমার খিদে বেড়ে গেল। সিদ্ধার্থদা তিনজনের জন্য ভাগ করে দিলেন। আমি সবে মুখে তুলতে গেছি, সিদ্ধার্থদা বললেন, খাচ্ছ যে, যদি বিষ মেশানো থাকে?

শুনেই আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম। কাকাবাবু বললেন, সূচা সিং সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। তোমরা আগে খেয়ো না, আমি খেয়ে দেখছি প্রথমে। আমি বুড়ো মানুষ, আমি মরলেও ক্ষতি নেই!

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে বললেন, বিষ মেশানো থাক। আর যাই থাক, এ রকম চমৎকার খাবার চোখের সামনে রেখে আমি না খেয়ে থাকতে পারব না।

টপ করে একটা মাংস তুলে কামড় বসিয়ে সিদ্ধার্থদা বললেন, বাঃ, গ্র্যান্ড! এ রকম খাবার পেলে আমি অনেকদিন এখানে থাকতে রাজি আছি!

সত্যিই যদি আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হয়, তাহলে স্নিগ্ধাদি আর রিণির কী হবে? সিদ্ধার্থদার যে সেজন্য কোনও চিন্তাই নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। খাটের তলায় আশ-দশটা কম্বল রাখা ছিল। কম্বলগুলো বেশ নোংরা, কিন্তু উপায় তো নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা না ঘুমিয়ে বিছানায় শুয়ে এখান থেকে উদ্ধার পাবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। কিন্তু কোনও পথই পাওয়া গেল না। কণিষ্কর মুণ্ডুটা না পেলে কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। সেটা সূচা সিং-এর কাছ থেকে কী করে উদ্ধার করা যাবে? বেশি কিছু করতে গেলে ও যদি মুণ্ডুটা ভেঙে ফেলে!

ভোরবেলা উঠেই সিদ্ধার্থদা বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে বললেন, কই, এখনও চা দেয়নি?

সকালবেলা বেড-টি খাওয়ার অভ্যোস, সিদ্ধার্থদা বোধহয় ভেবেছিলেন হোটেলের ঘরে শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসে সিদ্ধার্থদা বললেন, ব্যাটারা আচ্ছা অভদ্র তো, এখনও চা দেয় না কেন?

দরজার কাছে গিয়ে দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই হ্যায়? চা লৌ আও

আমি বললাম, ওরা বোধহয় চা খায় না।

সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই খায়! পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের মতনই চা খেতে খুব ভালবাসে।

কিন্তু কারুর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। চা তো দূরের কথা, সকালবেলা কেউ কোনও খাবারও দিতে এল না। কাল রাত্তিরে অত খাইয়ে হঠাৎ আজ সকালবেলা এই ব্যবহার! ভাগ্যিস ঘরটার সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম ছিল, নইলে আমাদের আরও অসুবিধে হত।

সিদ্ধার্থদা খানিকটা বাদে ধৈর্য হারিয়ে শিক ধরে টানাটানি করছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল। সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি।

আমিও ছুটে গেলাম জানলার কাছে। কাকাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন খাটে। সকাল থেকে কাকাবাবু একটাও কথা বলেননি।

আমাদের নিরাশ করে গাড়ি থেকে নামল সূচা সিং আর একটা লোক। সূচা সিং একা গট গট করে উঠে এল ওপরে। তার হাতে সেই মহামূল্যবান কাঠের বাক্সটি।

সিদ্ধার্থদা হালকাভাবে বললেন, কী সিংজী, সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলে? আমাদের চা খাওয়ালে না?

সূচা সিং কঠোরভাবে বলল, জানলাসে হঠ যাও! আমি প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলব!

কাকাবাবু তখনও খাটে বসে আছেন। সূচা সিং আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে খোকাবাবু, তোমার আংকেলের চশমাটা নিয়ে যাও! দেখুন প্রোফেসারসাব, আপনি যা চাইছেন, তাই দিচ্ছি! এবার আমার কথা শুনবেন।

চশমাটা পেয়ে কাকাবাবু স্পষ্টভাবে খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, সূচা সিং, তোমার সঙ্গে আমাদের তো কোনও ঝগড়া নেই। তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা পুলিশকে কিছু জনাব না তোমার নামে। আমি কথা দিচ্ছি!

সূচা সিং বিরক্তভাবে বলল, এক কথা বারবার বলতে আমি পছন্দ করি না! আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ঠিক করুন, আমার কথা শুনবেন কি না!

সিদ্ধার্থদা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ঘরের মধ্যে এসে বসুন, আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।

সূচা সিং প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, চোপ! তোমার কোনও কথা শুনতে চাইনা!

তারপর সে কাঠের বাক্স খুলে কণিষ্কর মুখটা দু আঙুলে তুলে উঁচু করে বলল, কী প্রোফেসারসাব, কিছু ঠিক করলেন?

কাকাবাবু পাথরের মুখটার দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সিংজী, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, তুমি ওটাকে ওভাবে ধরো না। সাবধানে ধরে। ওটা ভেঙে গেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে?

বটে! বটে! এটার তাহলে অনেক দাম!

সিংজী, তুমি ওটা ফেরত দাও, তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব। তার বেশি দেবার সামর্থ্য আমার নেই।

পাঁচ হাজার? একটা পাথরের মুণ্ডুর দাম পাঁচ হাজার! এ রকম পাথরকা চীজ তো হামেশা পাওয়া যায়। আপনি পাঁচ হাজার রুপিয়া দিতে চাইছেন! তাহলে এক লাখ রুপিয়ার কম আমি ছাড়ব না।

এক লাখ টাকা আমার নেই, থাকলে দিতাম। ও মূর্তিটার বাজারে কোনও দাম নেই। আমার কাছেই শুধু ওর দাম।

ওসব চালাকি ছাড়ুন। খাঁটি কথাটা কী বলুন!

সিদ্ধার্থদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ করে পাথরের মুখটা চেপে ধরলেন। তাপর বললেন, ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।

কাকাবাবু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, সিদ্ধার্থ ছেড়ে দাও, শিগগির ছেড়ে দাও! ভেঙে যাবে ওটা। তবু ওর কাছেই থাকুক!

সূচা সিং দু হাতে চেপে ধরেছে সিদ্ধার্থদার হাত। আস্তে আস্তে পাথরের মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠের বাক্সে রাখল। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে দেড় গুণ বড় কণিষ্কর মুখটা। বেশ ভারী। কিন্তু সূচা সিং অনায়াসেই হাল্কা বলের মতন সেটা বাঁ হাতে ধরে মাটিতে রাখল। তারপর সিদ্ধার্থদার হাতটা ধরে মোচড়াতে লাগল। সিদ্ধার্থদা যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে

ফেললেন। হাতটা বোধহয় ভেঙেই যাবে। আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে সূচা সিংকে অনুরোধ করলাম, ছেড়ে দিন! ওঁকে ছেড়ে দিন। আর কখনও এ রকম করবে না

সূচা সিং ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, বেতমীজ! আমার সঙ্গে জোর দেখাতে যায়! খুলে নেব হাতখানা?

যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থদার মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করলেন না। শেষ পর্যন্ত সূচা সিং এক ধাক্কা দিয়ে সিদ্ধার্থদাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর কর্কশ গলায় বলল, প্রোফেসার, শুনলে না। আমার কথা। তাহলে থাকো এখানে! আমি জম্মুতে চললাম, ওখানে আমার এক দোস্ত পাখরের দোকানদার, তাকে দেখাব জিনিসটা! তোমাদের মারব না-কাল আমার লোক এসে তোমাদের ছেড়ে দেবে।

সূচা সিং গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িটাতে উঠল। কাকাবাবুও খাট থেকে নেমে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গাড়িটা ছাড়ার পর সূচা সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল। তারপর চলে গেল হুশ করে!

গাড়িটা চলে যাওয়া মাত্র কাকাবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থদার পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, সিদ্ধার্থ, তোমার হাত ভাঙেনি তো?

সিদ্ধার্থদা, উঠে বসে বললেন, না, ভাঙেনি বোধহয় শেষ পর্যন্ত! শয়তানটাকে আমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেবই। এর প্রতিশোধ যদি না নিই-

শোনো, এখন এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শিগগির ওঠে! দরজা ভাঙতে হবে।

কাকাবাবু নিজেই খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। পুরু কাঠের দরজা-কেঁপে উঠল শুধু। সিদ্ধার্থদা উঠে এসে বললেন, কাকাবাবু, আপনি সরুন, আমি দেখছি!

না, না, এসো, আমরা তিনজনে মিলেই এক সঙ্গে ধাক্কা দিই–

সিদ্ধার্থদার দেখাদেখি আমিও অনেকটা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলাম দরজায়। প্রত্যেকবার শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে। কাকাবাবু বললেন, হোক শব্দ, তাই শুনে যদি কেউ আসে তো ভালই!

কেউ এল না। আমরা পর পর ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগলাম। বেশ খানিকটা বাদে একটা পাল্লায় একটু ফাটল দেখা দিল, তাই দেখে আমাদের উৎসাহ হয়ে গেল। দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত যে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারলাম, সেটা শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোরে।

ঘর থেকে বেরিয়েই কাকাবাবু বললেন, আমি দৌড়তে পারব না, তোমরা দুজন দৌড়ে যাও। বড় রাস্তায় গিয়ে যে-কোনও একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করো! যে-কোনও উপায়ে থামানো চাই। আমি আসছি। পরে–

প্রথমে একটা প্রাইভেট গাড়িকে থামাবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই থামল না। আর একটু হলে আমাদের চাপা দিয়ে চলে যেত। তারপর একটা বাস। এখানকার বাস মাঝরাস্তায় কিছুতেই থামে না। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও গাড়ি নেই। ততক্ষণে কাকাবাবু এসে পৌঁছেছেন। এবার দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল। কাকাবাবু বললেন, এসো সবাই মিলে রাস্তার মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়াই। এটাকে থামাতেই হবে।

জিপটা প্রচণ্ড জোরে হর্ন দিতে দিতে কাছাকাছি এসে গেল। সিদ্ধার্থদা হতাশভাবে বললেন, এটা মিলিটারির জিপ। এরা কিছুতেই থামে না।

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, থামাতেই হবে। না হলে চাপা দেয় দিক!

জিপটা আমাদের একেবারে সামনে এসে ব্রেক কষল। একজন অফিসার রুক্ষভাবে বললেন, হোয়াটস দা ম্যাটার জেন্টেলমেন?

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। অফিসারটির পোশাকের চিহ্ন দেখে বললেন, আপনি তো একজন করনেল? শুনুন করনেল, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। একটুও সময় নেই!

তারপর কাকাবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন করনেল। তারপর বললেন, হুঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমাকে জরুরি কাজে যেতে হচ্ছে।

কাকাবাবু গাড়ির সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যতই জরুরি কাজ থাক, আপনাকে যেতেই হবে।

কাকাবাবু গভর্নমেন্টের এক গাদা বড় বড় অফিসার, মিলিটারির অফিসারের নাম বললেন।

করনেল বললেন, আপনি ওসব যতই নাম বলুন, আমার মিলিটারি ডিউটির সময় আমি অন্য কারুর কথা শুনতে বাধ্য নই।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, মিলিটারি হিসেবে নয়, আপনাকে আমার দেশের একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি!

করনেল একটুক্ষণ ভু কুঁচকে বসে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, গেট ইন!

আমরা উঠে পড়তেই গাড়ি চলল। ফুল স্পীড়ে। কারনেল পুরো ব্যাপারটা আবার শুনলেন। তারপর বললেন, ইতিহাস সম্পর্কে আমারও ইন্টারেস্ট আছে। সত্যি, এটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। এটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।

করনেলের নাম রণজিৎ দত্তা। বাঙালি নয়, পাঞ্জাবি। প্রথমে তিনি আমাদের নিতে রাজি হচ্ছিলেন না, পরে কিন্তু বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। ওঁর কাছেও এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার।

গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে যে হাওয়ায় কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। কারনেল বললেন, ওদের গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে। পাহাড়ি রাস্তায় একটা মুস্কিল, কোনও গাড়িকে ওভারটেক করা যায় না। মাঝখানে যে-সব গাড়ি পড়ছে তাদের পার হব। কী করে?

কাকাবাবু বললেন, উপায় একটা বার করতেই হবে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, একটা উপায় আছে। উল্টো দিকের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য মাঝে মাঝে যে কয়েক জায়গায় খানিকটা করে কাটা আছে–

করনেল দত্তা বললেন, হ্যাঁ, সেটা একটা হতে পারে বটে। অবশ্য, যদি মাঝখানের গাড়িগুলো জায়গা দেয়।

আপনার মিলিটারির গাড়ি। আপনার গাড়ির হর্ন শুনলে সবাই রাস্তা দেবে। আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেছি।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, সামনের দাড়ি দেখলেই দুবার করে জোরে হর্ন দেবে। আপনার সূচা সিং-এর গাড়ি চিনতে পারবেন তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, সাদা জীপ গাড়ি। নম্বরও আমি মুখস্থ করে রেখেছি।

সিদ্ধার্থদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওঁর ডান হাতে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা এখনও।

পাহাড়ি রাস্তা। এঁকেবেঁকে চলেছে। রাস্তাটা ওপরে উঠে গেলে নীচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। একটু বাদেই আমরা যখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছি, পাহাড় পেরিয়ে নীচের দিকের রাস্তায় দেখতে পেলাম খেলনার মতন তিনটে গাড়ি। তার একটাকে বাস বলে চেনা যায়।

করনেল দূরবীন বার করলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ির নম্বরটা বলো তো, দেখি এর মধ্যে আছে কি না?

একটু দেখেই উত্তেজিতভাবে বললেন, দ্যাটস ইট! ঐ তো সাদা জীপ!

আমরা সবাই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম। এবার আর সূচা সিংকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় খুব জোরে তো গাড়ি চালানো যায় না, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে হর্ন দিয়ে গতি কমিয়ে দিতে হয়। একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের দেয়াল। খাদের নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে এক পশিলা, ভিজে রাস্তা বেশি বিপজ্জনক।

কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, কী সুন্দর রামধনু উঠেছে দ্যাখো। এ পাশের সারাটা আকাশ জুড়ে আছে। অনেকদিন বাদে সম্পূর্ণ রামধনু, দেখলাম—সাধারণত দেখা যায় না।

আমাদের চোখ নীচের রাস্তার সেই খেলনার মতন গাড়ির দিকে আবদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থদা অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, কাকাবাবু, আপনার এখন রামধনু দেখার মতন মনের অবস্থা আছে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছিনা।

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, মনকে বেশি চঞ্চল হতে দিতে নেই, তাতে কাজ নষ্ট হয়। দণ্ডকারণ্যে রাম যখন সীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়ও তিনি পাম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, বাসটা কাছাকাছি এসে গেছে। হর্ন দাও! হর্ন দাও-দুবার!

বাসটা সহজেই আমাদের পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু তার পরের গাড়িটা আর কিছুতেই জায়গা দিতে চায় না। আমরা সেটার পেছন পেছন এসে অনবরতহর্ন দিতে লাগলাম। মাইল

দুয়েক বাদে রাস্তাটা একটু চওড়া দেখেই বিপদের পুরো কুঁকি নিয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। সেই গাড়িটাতে শুধু একজন ড্রাইভার, আর কেউ নেই।

সিদ্ধার্থদা বললেন, ও গাড়ির ড্রাইভারটা বোধহয় কালা-আমাদের এত হর্ন ও শুনতে পায়নি।

করনেল বললেন, কালা লোকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কালা নয়, লোকটা পাজি।

এবার আমাদের ঠিক সামনে সূচা সিং-এর গাড়ি। বড় জোর সিকি মাইল দূরে। আমরা দেখতেও পাচ্ছি, গাড়িতে সূচা সিং আর তার একজন সঙ্গী বসে আছে। ওরাও নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের।

সিদ্ধার্থদা গাড়ির সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রায়। ছটফট করে বললেন, ব্যাটার আর কোনও উপায় নেই, এবার ওকে ধরবই।

আমাদের হর্নে ও-গাড়ি কর্ণপাতও করল না। দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে। ওরা মরিয়া হয়ে জোরে চালাচ্ছে। সূচা সিং খুব ভাল ড্রাইভার—আমরা আগে দেখেছি।

করনেল বেল্ট থেকে রিভলভার বার করে বললেন, ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি। কিন্তু তাতে একটা ভয় আছে গাড়িটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে।

কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, খবরদার, সে কাজও করবেন না। আমি সূচা সিংকে শাস্তি দিতে চাই না, আমি আমার জিনিসটা ফেরত চাই।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আর বেশি জোর চালালে আমাদের গাড়িই উল্টে একেবারে বিলম নদীতে পড়বে। ঐ দাখো, সন্তু, ঝিলম নদী!

আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অত নীচে তাকালে আমার মাথা বিমঝিম করে।

আট দশ মাইল চলল দুই গাড়ির রেস। ক্রমশ আমরাই কাছে চলে আসছি। কারনেল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন, হল্ট?

সূচা সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখল। কিন্তু গাড়ি থামাল না।

কাকাবাবু বললেন, করনেল দত্তা, সাবধান! সূচা সিং-এর কাছে আমার রিভলভারটা আছে।

করনেল বললেন, মিলিটারির গাড়ি দেখেও গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারুর নেই।

আর কয়েকমাইল গিয়েই ভাগ্য আমাদের পক্ষে এল। দেখতে পেলাম উল্টোদিক থেকে একটা কনভয় আসছে। এক সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা। লরি। সূচা সিং-এর আর উপায় নেই। কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে, পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা পাবে না।

করনেল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, আমাদের গাড়ির স্পীড কমিয়ে দাও। আগে দেখা যাক-ও কী করে।

সূচা সিং-এর গাড়ির গতিও কমে এল! এক জায়গায় ছোট একটা বাইপাস আছে, সেখানে গাড়ি ঘুরেই থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমেই দুদিকে দৌড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটে গেলাম। সূচা সিং-এর সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়চ্ছে উল্টো দিকের রাস্তায়। তার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না। সূচা সিং পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এক হাতে সেই কাঠের বাক্স।

সিদ্ধার্থদাই আগে আগে যাচ্ছিলেন। সূচা সিং হঠাৎ রিভলভার তুলে বলল, এদিকে এলে জানে মেরে দেব।

সিদ্ধার্থদা থমকে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু করনেল একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, কারনেলের হাতে রিভলভার ছাড়াও, ওঁর গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তাঁর হাতে একটা কী যেন কিম্ভূতি চেহারার অস্ত্র। দেখলেই ভয় করে। সূচা সিং সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিভলভারটা ফেলে দিল। কিন্তু তবু তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠল।

কাঠের বাক্সটা উঁচু করে ধরে বলল, এটার কী হবে প্রোফেসারসাব? আমার কাছে কেউ এলে আমি এটা নীচে নদীতে ফেলে দেব।

কাকাবাবু করনেলকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, আর এগোবেন না। ও সত্যিই ফেলে দিতে পারে।

তারপর কাকাবাবু হাতজোড় করে বললেন, সূচা সিং, তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা ফিরিয়ে দাও!

সূচা সিং আর একটা পাথর ওপরে উঠে গিয়ে বলল, এটা আমি দেব না। কিছুতেই দেব না?

ফিরিয়ে দাও সূচা সিং! গভর্নমেন্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব। আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব বলেছি-

বিশ্বাস করি না। তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসেছি। এটা ফিরিয়ে দিলেই তোমরা আমাকে ধরবে।

না ধরব না। তুমি বাক্সটা ওখানে পাথরের ওপর রেখে যাও। আমরা আধঘণ্টা আগে ছোঁব না। তুমি চলে না গেলে-

ওসব বাজে চালাকি ছাড়ো!

না, সত্যি, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি!

সূচা সিং বাক্সটা হাতে নিয়ে দোলাতে লাগল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

হুকুমের সুরে বলল, তোমরা এক্ষুনি গাড়িতে ফিরে যাও! না হলে আমি এটা ঠিক ফেলে দেব!

কাকাবাবু অসহায়ভাবে কারনেলের দিকে তাকালেন। ভাঙা গলায় বললেন, কী করা উচিত বলুন তো? আমাদের বোধহয় ওর কথা মতন গাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত! ও যদি ফিরে যায়-

করনেল বললেন, ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না। ওদিকে হয়তো নেমে যাবার রাস্তা আছে। ও পালাবে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সিদ্ধার্থদা এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ লক্ষ করেনি। আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে সিদ্ধার্থদা একেবারে সূচা সিং-এর সামনে পৌঁছে গেলেন। বাক্সটা ধরার জন্য সিদ্ধার্থদা, যেই হাত বাড়িয়েছেন, সূচা সিং ঠেলে দিতে গেল তাঁকে।

তারপর মরিয়ার মতন বলল, যাক, তাহলে আপদ যাক।

সূচা সিং বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে!

আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে রইলাম। কাকাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

সিদ্ধার্থদা বাঘের মতন সূচা সিং-এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

ঝটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে।

হোক ভয়ংকর, তবু সুন্দর

তারপর মাস তিনেক কেটে গেছে। কলকাতায় ফিরে এসেছি, এখন আবার ইস্কুলে যাই। সামনেই পরীক্ষা, খুব পড়াশুনা করতে হচ্ছে। অনেকদিন পড়াশুনো বাদ গেছে তো!

তবু প্রায়ই কাশ্মীরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয় স্বপ্নের মতন। গল্পের বইতে যে রকম পড়ি, সিনেমায় যে-রকম দেখি-আমার জীবনেও সে-রকম ঘটনা ঘটেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

এক একবার ভাবি, সেই পাইথনটা গুহার একেবারে ভিতরের দিকে না থেকে যদি বাইরের দিকে থাকত? যদি আমি পড়ে যাওয়া মাত্রই কামড়ে দিত? তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম? সেই কথা ভেবে নতুন করে ভয় হয়। কিংবা তাঁবুর মধ্যে সূচা সিং-এর দলবল যখন আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল, তখন ওরা তো আমাকে মেরে ফেলতেও পারত!

কী সব ভয়ংকর দিনই গেছে। হোক ভয়ংকর, তবু কত সুন্দর। আমাকে যদি আবার ঐ রকম জায়গায় কেউ যেতে বলে, আমি এক্ষুনি রাজি! আবার ঐ রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হলেও আমি ভয় পাব না! ঐ কটা দিনের অভিজ্ঞতাতেই যেন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

রিণি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। আমরা ঐ রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলাম, আর ওরা বসে ছিল শ্রীনগরে-এই জন্য ওর রাগ। কেন আমরা ওকে সঙ্গে নিইনি! আমি বলেছি, যা যা ভাগ। তোকে সঙ্গে নিলে আরও কত বিপদ হত তার ঠিক আছে! সূচা সিং-এর রাগী মুখ দেখলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যেতিস!

রিণি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে সূচা সিং-এর রাগী মুখের একটা ছবি এঁকেছে। সেটা মোটেই সূচা সিং-এর মতন দেখতে নয়, বক-রক্ষসের মতন।

সিদ্ধার্থদার হাতে বুকে এখনও প্লাস্টার বাঁধা। সিদ্ধার্থদা পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলেন সূচা সিং-কে সঙ্গে নিয়ে। সূচা সিং-এর দেহের ভারেই সিদ্ধার্থদার বুকের তিনটে পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল, আর ডান হাতটা ছেচে গিয়েছিল খানিকটা! সিদ্ধার্থদা এখন আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠছেন। সিদ্ধার্থদার গর্ব এই, তবু তো তিনি একবার অন্তত সেই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসটা ছুতে পেরেছিলেন।

সূচা সিং-ও বেঁচে গেছে। তারও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে–এখন সে জেলে। সূচা সিং-এর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। ওরা যখন বড় হয়ে শুনবে, ওদের বাবা একজন ডাকাত, তখন কি ওদের খুব দুঃখ হবে না? চোর-ডাকাতের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী হয়।

কাকাবাবুও সেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁকে তখন ধরাধরি করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কুদ নামে একটা জায়গায়। সেখানে একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। কারনেল দত্তা যে আমাদের কত সাহায্য করেছিলেন তা বলে বোঝানো যায় না। কাকাবাবু অবশ্য দু তিনদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন খানিকটা। তারপরই আবার সেই পাথরের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

সূচা সিং যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে ওটা ঝিলম নদীতেই পড়ার কথা। কিন্তু তিনদিন ধরে ঝিলম নদীর অনেকখানি এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। সেই পাহাড়টার সব জায়গাও তন্নতন্ন করে খোঁজা বাকি থাকেনি। অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল, কে জানে?

কাকাবাবু আমাকে বারণ করেছেন, ওটার কথা কারুকে বলতে। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে।

আমার এখনও ধারণা, কাঠের বাক্সটা সহজে ডুবে যাবে না। ঝিলম নদীর তীরে কোথাও না কোথাও একদিন ওটাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে।